বাংলা শব্দতত্ত্ব

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাষার কথা

পদ্মায় যখন পুল হয় নাই তখন এপারে ছিল চওড়া রেলপথ , ওপারে ছিল সরু । মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ ছিল বলিয়া রেলপথের এই দ্বিধা আমাদের সহিয়াছিল । এখন সেই বিচ্ছেদ মিটিয়া গেছে তবু ব্যবস্থার কার্পণ্যে যখন অর্ধেক রাত্রে জিনিসপত্র লইয়া গাড়ি বদল করিতে হয় তখন রেলের বিধাতাকে দোষ না দিয়া থাকিতে পারি না ।

ও তো গেল মানুষ এবং মাল চলাচলের পথ , কিন্তু ভাব চলাচলের পথ হইল ভাষা । কিছুকাল হইতে বাংলাদেশে এই ভাষায় দুই বহরের পথ চলিত আছে । একটা মুখের বুলির পথ , আর-একটা পুঁথির বুলির পথ । দুই-একজন সাহসিক বলিতে শুরু করিয়াছেন যে , পথ এক মাপের হইলে সকল পক্ষেই সুবিধা । অথচ ইহাতে বিস্তর লোকের অমত । এমন-কি তাঁরা এতই বিচলিত যে , সাধু ভাষার পক্ষে তাঁরা যে ভাষা প্রয়োগ করিতেছেন তাহাতে বাংলা ভাষায় আর যা-ই হোক , সাধুতার চর্চা হইতেছে না।

এ তর্কে যদিও আমি যোগ দিই নাই তবু আমার নাম উঠিয়াছে । এ সম্বন্ধে আমার যে কী মত তাহা আমি ছাড়া আমার দেশের পনেরো-আনা লোকেই একপ্রকার ঠিক করিয়া লইয়াছেন , এবং যাঁর যা মনে আছে বলিতে কসুর করেন নাই । ভাবিয়াছিলাম চারি দিকের তাপটা কমিলে ঠাণ্ডার সময় আমার কথাটা পাড়িয়া দেখিব । কিন্তু বুঝিয়াছি সে আমার জীবিতকালের মধ্যে ঘটিবার আশা নাই । অতএব আর সময় নষ্ট করিব না।

ছোটোবেলা হইতেই সাহিত্য রচনায় লাগিয়াছি । বোধ করি সেইজন্যই ভাষাটা কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোনো মত ছিল না । যে-বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন , পুঁথির ভাষাতেই পুঁথি লেখা চাই , এ কথায় সন্দেহ করিবার সাহস বা বুদ্ধি ছিল না । তাই , সাহিত্য-ভাষার পথটা

এই সরু বহরের পথ , তাহা যে প্রাকৃত বাংলা ভাষার চওড়া বহরের পথ নয় , এই কথাটা বিনা দ্বিধায় মনের মধ্যে পাকা হইয়া গিয়াছিল।

একবার যেটা অভ্যাস হইয়া যায় সেটাতে আর নাড়া দিতে ইচ্ছা হয় না । কেননা স্বভাবের চেয়ে অভ্যাসের জোর বেশি। অভ্যাসের মেঠো পথ দিয়া গাড়ির গোরু আপনিই চলে, গাড়োয়ান ঘুমাইয়া পড়িলেও ক্ষতি হয় না । কিন্তু ইহার চেয়ে প্রবল কারণ এই যে , অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা অহংকারের যোগ আছে । যেটা বরাবর করিয়া আসিয়াছি সেটার যে অন্যথা হইতে পারে এমন কথা শুনিলে রাগ হয় । মতের অনৈক্য রাগারাগি হইবার প্রধান কারণই এই অহংকার। মনে আছে বহুকাল পূর্বে যখন বলিয়াছিলাম বাঙালির শিক্ষা বাংলা ভাষার যোগেই হওয়া উচিত তখন বিস্তর শিক্ষিত বাঙালি আমার সঙ্গে যে কেবল মতে মেলেন নাই তা নয় তাঁরা রাগ করিয়াছিলেন। অথচ এ জাতীয় মতের অনৈক্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির মধ্যে পড়ে না। আসল কথা , যাঁরা ইংরাজি শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন, তাঁরা বাংলা শিখিয়া মানুষ হইবার প্রস্তাব শুনিলেই যে উদ্ধত হইয়া ওঠেন, মূলে তার অহংকার।

একদিন নিজের স্বভাবেই ইহার পরিচয় পাইয়াছিলাম , সে কথাটা এইখানেই কবুল করি । পূর্বেই তো বলিয়াছি যে-ভাষা পুঁথিতে পড়িয়াছি সেই ভাষাতেই চিরদিন পুঁথি লিখিয়া হাত পাকাইলাম ; এ লইয়া এপক্ষে বা ওপক্ষে কোনোপ্রকার মত গড়িয়া তুলিবার সময় পাই নাই । কিন্তু ‘ সবুজ পত্র ' -সম্পাদকের বুদ্ধি নাকি তেমন করিয়া অভ্যাসের পাকে জড়ায় নাই এইজন্য তিনি ফাঁকায় থাকিয়া অনেকদিন হইতেই বাংলা সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে একটা মত খাড়া করিয়াছেন।

বহুকাল পূর্বে তাঁর এই মত যখন আমার কানে উঠিয়াছিল আমার একটুও ভালো লাগে নাই । এমন-কি রাগ করিয়াছিলাম । নূতন মতকে পুরাতন সংস্কার অহংকার বলিয়া তাড়া করিয়া আসে , কিন্তু অহংকার যে পুরাতন সংস্কারের পক্ষেই প্রবল এ কথা বুঝিতে সময় লাগে । অতএব , প্রাকৃত বাংলাকে পুঁথির পঙ্‌ক্তিতে তুলিয়া লইবার বিরুদ্ধে আজকের দিনে যে-সব

যুক্তি শোনা যাইতেছে সেগুলো আমিও একদিন আবৃত্তি করিয়াছি।
এক জায়গায় আমার মন অপেক্ষাকৃত সংস্কার-মুক্ত । পদ্য রচনায় আমি প্রচলিত আইন-কানুন কোনোদিন মানি নাই । জানিতাম কবিতায় ভাষা ও ছন্দের একটা বাঁধন আছে বটে , কিন্তু সে বাঁধন নূপুরের মতো , তাহা বেড়ির মতো নয় । এইজন্য কবিতার বাহিরের শাসনকে উপেক্ষা করিতে কোনোদিন ভয় পাই নাই ।

‘ ক্ষণিকা ' য় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও প্রাকৃত বাংলার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম । তখন সেই ভাষার শক্তি , বেগ ও সৌন্দর্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি । দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগাঁয়ের টাট্টু ঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্য-ভাবের বাহন নয় , ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশি।

বলা বাহুল্য ‘ ক্ষণিকা ' য় আমি কোনো পাকা মত খাড়া করিয়া লিখি নাই , লেখার পরেও একটা মত যে দৃঢ় করিয়া চলিতেছি তাহা বলিতে পারি না । আমার ভাষা রাজাসন এবং রাখালী , মথুরা এবং বৃন্দাবন , কোনোটার উপরেই আপন দাবি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই । কিন্তু কোন্ দিকে তার অভ্যাসের টান এবং কোন্ দিকে অনুরাগের , সে বিচার পরে হইবে এবং পরে করিবে ।

এইখানে বলা আবশ্যক চিঠিপত্রে আমি চিরদিন কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছি । আমার সতেরো বছর বয়সে লিখিত ‘ য়ুরোপ যাত্রীর পত্রে ' এই ভাষা প্রয়োগের প্রমাণ আছে। তা ছাড়া বক্তৃতাসভায় আমি চিরদিন প্রাকৃত বাংলা ব্যবহার করি , ‘ শান্তিনিকেতন ' গ্রন্থে তাহার উদাহরণ মিলিবে।

যাই হোক এ সম্বন্ধে আমার মনে যে তর্ক আছে সে এই – বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাশে , এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত , বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ । তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই । এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়া ছিল , সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না

BANGLADARPAN.COM

। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই । সীতাকে নির্বাসন দিয়া যজ্ঞকর্তার ফরমাশে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন ।

যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইত , তবে এমন গড়াপেটা ভাষা দিয়া তার আরম্ভ হইত না । তবে গোড়ায় তাহা কাঁচা থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নিয়মে তার বাঁধন আঁট হইয়া উঠিত । প্রাকৃত বাংলা বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে প্রয়োজনমত সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত ।

কিন্তু বাংলা গদ্য-সাহিত্য ঠিক তার উল্‌টা পথে চলিল । গোড়ায় দেখি তাহা সংস্কৃত ভাষা , কেবল তাহাকে বাংলার নামে চালাইবার জন্য কিছু সামান্য পরিমাণে তাহাতে বাংলার খাদ মিশাল করা হইয়াছে । এ একরকম ঠকানো । বিদেশীর কাছে এ প্রতারণা সহজেই চলিয়াছিল।

যদি কেবল ইংরেজকে বাংলা শিখাইবার জন্যই বাংলা গদ্যের ব্যবহার হইত , তবে সেই মেকি-বাংলার ফাঁকি আজ পর্যন্ত ধরা পড়িত না । কিন্তু এই গদ্য যতই বাঙালির ব্যবহারে আসিয়াছে ততই তাহার রূপ পরিবর্তন হইয়াছে । এই পরিবর্তনের গতি কোন্ দিকে ? প্রাকৃত বাংলার দিকে । আজ পর্যন্ত বাংলা গদ্য , সংস্কৃত ভাষার বাধা ভেদ করিয়া , নিজের যথার্থ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রকাশ করিবার জন্য যুঝিয়া আসিতেছে ।

অল্প মূলধনে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ক্রমশ মুনফার সঙ্গে সঙ্গে মূলধনকে বাড়াইয়া তোলা , ইহাই ব্যবসার স্বাভাবিক প্রণালী । কিন্তু বাংলা-গদ্যের ব্যাবসা মূলধন লইয়া শুরু হয় নাই , মস্ত একটা দেনা লইয়া তার শুরু । সেই দেনাটা খোলসা করিয়া দিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিবার জন্যই তার চেষ্টা।

আমাদের পুঁথির ভাষার সঙ্গে কথার ভাষার মিলন ঘটিতে এত বাধা কেন , কার কারণ আছে । যে গদ্যে বাঙালি কথাবার্তা কয় সে গদ্য বাঙালির

মনোবিকাশের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে । সাধারণত বাঙালি যে-বিষয় ও যে-ভাব লইয়া সর্বদা আলোচনা করিয়াছে বাংলার চলিত গদ্য সেই মাপেরই । জলের পরিমাণ যতটা , নদী-পথের গভীরতা ও বিস্তার সেই অনুসারেই হইয়া থাকে । স্বয়ং ভগীরথও আগে লম্বা-চওড়া পথ কাটিয়া তার পরে গঙ্গাকে নামাইয়া আনেন নাই ।

বাঙালি যে ইতিপূর্বে কেবলই চাষবাস এবং ঘরকন্নার ভাবনা লইয়াই কাটাইয়াছে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে । কিন্তু ইতিপূর্বে তার চেয়ে বড়ো কথা যাঁরা চিন্তা করিয়াছেন তাঁরা বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ । তাঁরা প্রধানত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল । তাঁদের শিক্ষা এবং ব্যাবসা , দুইয়েরই অবলম্বন ছিল সংস্কৃত পুঁথি । এইজন্য ঠিক বাংলা ভাষায় মনন করা বা মত প্রকাশ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না । তাই সেকালের গদ্য উচ্চ চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিতে পারে নাই ।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও আমাদের দেশে ভাষা ও চিন্তার মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে । যাঁরা ইংরেজিতে শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁদের পক্ষে ইংরেজিতেই চিন্তা করা সহজ ; বিশেষত যে-সকল ভাব ও বিষয় ইংরেজি হইতেই তাঁরা প্রথম লাভ করিয়াছেন সেগুলা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করা দুঃসাধ্য । কাজেই আমাদের ইংরেজি-শিক্ষা ও বাংলা ভাষা সদরে অন্দরে স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিয়া আসিতেছে ।

এমন সময় যাঁরা শিক্ষার সঙ্গে ভাষার মিল ঘটাইতে বসিলেন বাংলার চলিত গদ্য লইয়া কাজ চালানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হইল । শুধু যদি শব্দের অভাব হইত তবে ক্ষতি ছিল না কিন্তু সব চেয়ে বিপদ এই যে , নূতন শব্দ বানাইবার শক্তি প্রাকৃত বাংলার মধ্যে নাই । তার প্রধান কারণ বাংলায় তদ্ধিত প্রত্যয়ের উপকরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত সংকীর্ণ । ‘ প্রার্থনা ' সংস্কৃত শব্দ , তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ ‘ চাওয়া ' । ‘ প্রার্থিত ' ‘ প্রার্থনীয় ' শব্দের ভাবটা যদি ঐ খাঁটি বাংলায় ব্যবহার করিতে যাই তবে অন্ধকার দেখিতে হয় । আজ পর্যন্ত কোনো দুঃসাহসিক ‘ চায়িত ' ও ‘ চাওনীয় ' বাংলায় চালাইবার প্রস্তাব মাত্র করেন নাই । মাইকেল অনেক জায়গায় সংস্কৃত বিশেষ্যপদকে বাংলার

ধাতুরূপের অধীন করিয়া নূতন ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়াছেন । কিন্তু বাংলায় এ পর্যন্ত তাহা আপদ আকারেই রহিয়া গেছে , সম্পদরূপে গণ্য হয় নাই ।

সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তার তদ্ধিত প্রত্যয় পর্যন্ত লইতে গেলে সংস্কৃত ব্যাকরণেরও অনেকটা অংশ আপনি আসিয়া পড়ে । সুতরাং দুই নৌকায় পা দিবামাত্রই যে টানাটানি বাধিয়া যায় তাহা ভালো করিয়া সামলাইতে গেলে সাহিত্য-সার্কাসের মল্লগিরি করিতে হয় । তার পর হইতে এ তর্কের আর কিনারা পাওয়া যায় না যে , নিজের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বাধীন অধিকার কতদূর এবং তাহাতে সংস্কৃত শাসনের সীমা কোথায় । সংস্কৃত বৈয়াকরণের উপর যখন জরিপ জমাবন্দীর ভার পড়ে তখন একেবারে বাংলার বাস্তুভিটার মাঝখানটাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিগাড়ি হয় , আবার অপর পক্ষের উপর যখন ভার পড়ে তখন তাঁরা বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ বিভাগে একেবারে দক্ষযজ্ঞ বাধাইয়া দেন ।

কিন্তু মুশকিলের বিষয় এই যে , যে-ভাষায় মল্লবিদ্যার সাহায্য ছাড়া এক-পা চলিবার জো নাই সেখানে সাধারণের পক্ষে পদে পদে অগ্রসর হওয়ার চেয়ে পদে পদে পতনের সম্ভাবনাই বেশি । পথটাই যেখানে দুর্গম সেখানে হয় মানুষের চলিবার তাগিদ থাকে না , নয় চলিতে হইলে পথ অপথ দুটোকেই সুবিধা অনুসারে আশ্রয় করিতে হয় । ঘাটে মাল নামাইতে হইলে যে দেশে মাশুলের দায়ে দেউলে হওয়ার কথা সে দেশে আঘাটায় মাল নামানোর অনুকূলে নিশ্চয়ই স্বয়ং বোপদের চোখ টিপিয়া ইশারা করিয়া দিতেন । কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় ; বোপদেবের চেলারা যেখানে ঘাঁটি আগলাইয়া বসিয়া আছেন সেখানে বাংলা ভাষায় বাংলা - সাহিত্যের ব্যাবসা চালানো দুঃসাধ্য হইল ।

জাপানিদের ঠিক এই বিপদ । চীনা ভাষার শাসন জাপানি ভাষার উপর অত্যন্ত প্রবল । তার প্রধান কারণ প্রাকৃত জাপানি প্রাকৃত বাংলার মতো ; নূতন প্রয়োজনের ফরমাশ জোগাইবার শক্তি তার নাই । সে শক্তি প্রাচীন চীনা ভাষার আছে । এই চীনা ভাষাকে কাঁধে লইয়া জাপানি ভাষাকে চলিতে হয় ।

কাউন্ট ওকুমা আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন যে , এই বিষম পালোয়ানীর দায়ে জাপানি-সাহিত্যের বড়োই ক্ষতি করিতেছে । কারণ এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে , যে-ভাষায় ভাবপ্রকাশ করাটাই একটা কুস্তিগিরি সেখানে ভাবটাকেই খাটো হইয়া থাকিতে হয় । যেখানে মাটি কড়া সেখানে ফসলের দুর্দিন । যেখানে শক্তির মিতব্যয়িতা , অসম্ভব শক্তির সদ্‌ব্যয়ও সেখানে অসম্ভব । যদি পণ্ডিতমশায়দের এই রায়ই পাকা হয় যে , সংস্কৃত ভাষায় মহামহোপাধ্যায় না হইলে বাংলা ভাষায় কলম ধরা ধৃষ্টতা , তবে যাঁদের সাহস আছে ও মাতৃভাষার উপর দরদ আছে , প্রাকৃত বাংলার জয়পতাকা কাঁধে লইয়া তাঁদের বিদ্রোহে নামিতে হইবে ।

ইহার পূর্বেও ‘ আলালের ঘরের দুলাল ' প্রভৃতির মতো বই বিদ্রোহের শাঁখ বাজাইয়াছিল কিন্তু তখন সময় আসে নাই । এখনি যে আসিল এ কথা বলিবার হেতু কী ? হেতু আছে । তাহা বলিবার চেষ্টা করি ।

ইংরেজি হইতে আমরা যা লাভ করিয়াছি যখন আমাদের দেশে ইংরেজিতেই তার ব্যাবসা চলিতেছিল তখন দেশের ভাষার সঙ্গে দেশের শিক্ষার কোনো সামঞ্জস্য ঘটে নাই । রামমোহন রায় হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত ক্রমাগতই নূতন ভাব ও নূতন চিন্তা আমাদের ভাষার মধ্যে আনাগোনা করিতেছে । এমন করিয়া আমাদের ভাষা চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিয়াছে । এখন আমরা ঘরে ঘরে মুখে মুখে যে-সব শব্দ নিরাপদে ব্যবহার করি তাহা আর পঁচিশ বছর পূর্বে করিলে দুর্ঘটনা ঘটিত । এখন আমাদের ভাষা-বিচ্ছেদের উপর সাঁড়া ব্রিজ বাঁধা হইয়াছে । এখন আমরা মুখের কথাতেও নূতন পুরাতন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি আবার পুঁথির ভাষাতেও এমন শব্দ চলিতেছে পূর্বে সাধু ভাষায় যাদের জল-চল ছিল না । সেইজন্যই পুঁথির ভাষায় ও মুখের ভাষায় সমান বহরের রেল পাতিবার যে-প্রস্তাব উঠিয়াছে , অভ্যাসের আরামে ও অহংকারে ঘা লাগিলেও সেটাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না ।

আসল কথা , সংস্কৃত ভাষা যে-অংশে বাংলা ভাষার সহায় সে-অংশে তাহাকে লইতে হইবে , যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে ।

বাংলাকে সংস্কৃতের সন্তান বলিয়াই যদি মানিতে হয় তবে সেইসঙ্গে এ কথাও মানা চাই যে , তার ষোলো বছর পার হইয়াছে , এখন আর শাসন চলিবে না , এখন মিত্রতার দিন । কিন্তু যতদিন বাংলা বইয়ের ভাষা চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে ততদিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য সীমানা পাকা হইতে পারিবে না । ততদিন সংস্কৃত বৈয়াকরণের বর্গির দল আমাদের লেখকদের ত্রস্ত করিয়া রাখিবেন । প্রাকৃত বাংলার ঠাটে যখন লিখিব তখন স্বভাবতই সুসংগতির নিয়মে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব বাংলা ভাষার বেড়া ডিঙাইয়া উৎপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবে ।

পূবেই বলিয়াছি , বেড়ার ভিতরকার গাছ যেখানে একটু-আধটু ফাঁক পায় সেইখান দিয়াই আলোর দিকে ডালপালা মেলে , তেমনি করিয়াই বাংলার সাহিত্য-ভাষা সংস্কৃতের গরাদের ভিতর দিয়া , চল্‌তি ভাষার দিকে মাঝে মাঝে মুখ বাড়াইতে শুরু করিয়াছিল । তা লইয়া তাহাকে কম লোকনিন্দা সহিতে হয় নাই । এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের দিনে তাঁকে কটুকথা অনেক সহিতে হইয়াছে । তাই মনে হয় আমাদের দেশে এই কটু কথার হাওয়াটাই বসন্তের দক্ষিণ হাওয়া । ইহা কুঞ্জবনকে নাড়া দিয়া তাড়া দিয়া অস্থির করিয়া দেয় । কিন্তু এই শাসনটা ফুলের কীর্তন পালার প্রথম খোলের চাঁটি ।

পুঁথির বাংলার যে অংশটা লইয়া বিশেষভাবে তর্ক প্রবল , তাহা ক্রিয়ার রূপ । ‘ হইবে ' র জায়গায় ‘ হবে ' , ‘ হইতেছে ' র জায়গায় ‘ হচ্চে ' ব্যবহার করিলে অনেকের মতে ভাষার শুচিতা নষ্ট হয় । চীনারা যখন টিকি কাটে নাই তখন টিকির খর্বতাকে তারা মানের খর্বতা বলিয়া মনে করিত । আজ যেই তাহাদের সকলের টিকি কাটা পড়িল অমনি তাহারা হাঁফ ছাড়িয়া বলিতেছে , আপদ গেছে । এক সময়ে ছাপার বহিতে ‘ হয়েন ' লেখা চলিত , এখন ‘ হন ' লিখিলে কেহ বিচলিত হন না । ‘ হইবা ' ‘ করিবা ' র আকার গেল , ‘ হইবেক ' ‘ করিবেক ' -এর ক খসিল , ‘ করহ ' ‘ চলহ ' র হ কোথায় ? এখন ‘ নহে ' র জায়গায় ‘ নয় ' লিখিলে বড়ো কেহ লক্ষ্যই করে না । এখন যেমন আমরা ‘ কেহ ' লিখি , তেমনি এক সময়ে ছাপার বইয়েও ‘ তিনি ' র বদলে ‘ তেঁহ '

লিখিত । এক সময়ে ‘ আমারদিগের ' শব্দটা শুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল , এখন ‘ আমাদের ' লিখিতে কারো হাত কাঁপে না । আগে যেখানে লিখিতাম ‘ সেহ ' এখন সেখানে লিখি ‘ সেও ' , অথচ পণ্ডিতের ভয়ে ‘ কেহ ' কে ‘ কেও ' অথবা ‘ কেউ ' লিখিতে পারি না । ভবিষ্যৎবাচক ‘ করিহ ' শব্দটাকে ‘ করিয়ো ' লিখিতে সংকোচ করি না , কিন্তু তার বেশি আর একটু অগ্রসর হইতে সাহস হয় না ।

এই তো আমরা পণ্ডিতের ভয়ে সতর্ক হইয়া চলি কিন্তু পণ্ডিত যখন পুঁথির বাংলা বানাইয়াছিলেন আমাদের কিছুমাত্র খাতির করেন নাই । বাংলা গদ্য-পুঁথিতে যখন তাঁরা ‘ যাইয়াছি ' ‘ যাইল ' কথা চালাইয়া দিলেন তখন তাঁরা ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করেন নাই যে , এই ক্রিয়াপদটি একেবারে বাংলাই নয় । যা ধাতু বাংলায় কেবলমাত্র বর্তমান কালেই চলে ; যথা , যাই , যাও , যায় । আর , ‘ যাইতে ' শব্দের যোগে যে-সকল ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয় তাহাতেও চলে ; যেমন , ‘ যাচ্চি ' ‘ যাচ্ছিল ' ইত্যাদি । কিন্তু ‘ যেল ' ‘ যেয়েছি ' ‘ যেয়েছিলুম ' পণ্ডিতদের ঘরেও চলে না । এ স্থলে আমরা বলি ‘ গেল ' ‘ গিয়েছি ' ‘ গিয়েছিলুম ' । তার পরে পণ্ডিতেরা ‘ এবং ' বলিয়া এক অদ্ভুত অব্যয় শব্দ বাংলার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন এখন তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলা দায় । অথচ সংস্কৃত বাক্যরীতির সঙ্গে এই শব্দ ব্যবহারের যে মিল আছে তাও তো দেখি না । বর ' সংস্কৃত ‘ অপর ' শব্দের আত্মজ যে ‘ আর ' শব্দ সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা শুদ্ধরীতিসংগত । বাংলায় ‘ ও ' বলিয়া একটা অব্যয় শব্দ আছে তাহা সংস্কৃত অপি শব্দের বাংলা রূপ । ইহা ইংরেজি ‘and' শব্দের প্রতিশব্দ নহে , too শব্দের প্রতিশব্দ । আমরা বলি আমিও যাব তুমিও যাবে – কিন্তু কখনো বলি না ‘ আমি ও তুমি যাব ' । সংস্কৃতের ন্যায় বাংলাতেও আমরা সংযোজক শব্দ ব্যবহার না করিয়া দ্বন্দ্বসমাস ব্যবহার করি । আমরা বলি ‘ বিছানা বালিশ মশারি সঙ্গে নিয়ো ' । যদি ভিন্ন শ্রেণীয় পদার্থের প্রসঙ্গ করিতে হয় তবে বলি ‘ বিছানা বালিশ মশারি আর বাইরের বাক্সটা সঙ্গে নিয়ো ' । এর মধ্যে ‘ এবং ' কিংবা ‘ ও ' কোথাও স্থান পায় না । কিন্তু পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার আইনকে আমল দেন নাই । আমি এই যে দৃষ্টান্তগুলি দেখাইতেছি তার মতলব এই যে , পণ্ডিতমশায়

যদি সংস্কৃতরীতির উপর ভর দিয়া বাংলারীতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন , তবে আমরাই বা কেন বাংলারীতির উপর ভর দিয়া যথাস্থানে সংস্কৃতরীতিকে লঙ্ঘন করিতে সংকোচ করি ? ‘ মনোসাধে ' আমাদের লজ্জা কিসের ? ‘ সাবধানী ' বলিয়া তখনি জিব কাটিতে যাই কেন ? এবং ‘ আশ্চর্য হইলাম ' বলিলে পণ্ডিতমশায় ‘ আশ্চর্যান্বিত হয়েন ' কী কারণে ?

আমি যে-কথাটা বলিতেছিলাম সে এই—যখন লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার অসামঞ্জস্য থাকে তখন স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই এই দুই ভাষার মধ্যে কেবলই সামঞ্জস্যের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইংরেজি-গদ্যসাহিত্যের প্রথম আরম্ভে অনেকদিন হইতেই এই চেষ্টা চলিতেছিল। আজ তার কথায় লেখায় সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বলিয়াই উভয়ে একটা সাম্যদশায় আসিয়াছে। আমাদের ভাষায় এই অসামঞ্জস্য প্রবল সুতরাং স্বভাব আপনি উভয়ের ভেদ ঘুচাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে আয়োজন করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ আইনকর্তার প্রাদুর্ভাব হইল। তাঁরা বলিলেন লেখার ভাষা আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ইহার বেশি আর তার নড়িবার হুকুম নাই।

‘সবুজ পত্র’-সম্পাদক বলেন বেচারা পুঁথির ভাষার প্রাণ কাঁদিতেছে কথায় ভাষার সঙ্গে মালা বদল করিবার জন্য। গুরুজন ইহার প্রতিবাদী। তিনি ঘটকালি করিয়া কৌলীন্যের নির্মম শাসন ভেদ করিবেন এবং শুভ বিবাহ ঘটাইয়া দিবেন—কারণ কথা আছে শুভস্য শীঘ্রং।

যাঁরা প্রতিবাদী তাঁরা এই বলিয়া তর্ক করেন যে, বাংলায় চলিত ভাষা নানা জিলায় নানা ছাঁচের, তবে কি বিদ্রোহীর দল একটা অরাজকতা ঘটাইবার চেষ্টায় আছে! ইহার উত্তর এই যে, যে যেমন খুশি আপন প্রাদেশিক ভাষায় পুঁথি লিখিবে, চলিত ভাষায় লিখিবার এমন অর্থ নয়। প্রথমত খুশিরও একটা কারণ থাকা চাই। কলিকাতার উপর রাগ করিয়া বীরভূমের লোক বীরভূমের প্রাদেশিক ভাষায় আপন বই লিখিবে এমন খুশিটাই তার স্বভাবত হইবে না। কোনো একজন পাগলের তা হইতেও পারে কিন্তু পনেরো-আনার তা হইবে না। দিকে দিকে বৃষ্টির বর্ষণ হয় কিন্তু জমির ঢাল অনুসারে একটা বিশেষ

জায়গায় তার জলাশয় তৈরি হইয়া উঠে। ভাষারও সেই দশা। স্বাভাবিক কারণেই কলিকাতা অঞ্চলে একটা ভাষা জমিয়া উঠিয়াছে তাহা বাংলার সকল দেশের ভাষা। কলিকাতার একটা স্বকীয় অপভাষা আছে যাহাতে ‘গেনু’ ‘করনু’ প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় এবং ‘ভেয়ের বে’ (ভাইয়ের বিয়ে) ‘চেলের দাম’ (চালের দাম) প্রভৃতি অপভ্রংশ প্রচলিত আছে, এ সে ভাষাও নয়। যদি বলো—তবে এই ভাষাকে কে সুনির্দিষ্ট করিয়া দিবে? তবে তার উত্তর এই যে, যে-সকল লেখক এই ভাষা ব্যবহার করিবেন তাঁদের যদি প্রতিভা থাকে তবে তাঁরা তাঁদের সহজ শক্তি হইতেই বাংলার এই সর্বজনীন ভাষা বাহির করিবেন। দান্তে নিজের প্রতিভাবলে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন ইটালির কোন্ প্রাদেশিক ভাষা ইটালির সর্বদেশের সর্বকালের ভাষা। বাংলার কোন্ ভাষাটি সেইরূপ বাংলার বিশ্বভাষা কিছুকাল হইতে আপনিই তার প্রমাণ চলিতেছে। বঙ্কিমের কাল হইতে এ পর্যন্ত বাংলার গদ্য-সাহিত্যে প্রাদেশিক ভাষার প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে বলিয়া কথা উঠিয়াছে কিন্তু সে কোন্ প্রাদেশিক ভাষা? তাহা ঢাকা অঞ্চলের নহে। তাহা কোনো বিশেষ পশ্চিম বাংলা প্রদেশেরও নয়। তাহা বাংলার রাজধানীতে সকল প্রদেশের মথিত একটি ভাষা। সকল ভদ্র ইংরেজের এক ভাষা যেমন ইংলণ্ডের সকল প্রাদেশিক ভাষাকে ছাপাইয়া বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে, এ-ও সেইরূপ। এ ভাষা এখনো তেমন সম্পূর্ণভাবে ছড়াইয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু সাহিত্যকে আশ্রয় করিলেই ইহার ব্যাপ্তির সীমা থাকিবে না। সমস্ত দেশের লোকের চিত্তের ঐক্যের পক্ষে কি ইহার কোনো প্রয়োজন নাই? শুধু কি পুঁথির ভাষার ঐক্যই একমাত্র ঐক্যবন্ধন? আর এ কথাও কি সত্য নয় যে, পুঁথির ভাষা আমাদের নিত্য ব্যবহারের ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তাহা কখনোই পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে পারে না? যখন বঙ্গবিভাগের বিভীষিকায় আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়াছিল তখন আমাদের ভয়ের একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে এটা রাজনৈতিক ভূগোলের ভাগ নয়, ভাষার ভাগকে আশ্রয় করিয়া বাংলার পূর্ব-পশ্চিমে একটা চিত্তের ভাগ হইবে। সমস্ত বাংলাদেশের একমাত্র রাজধানী থাকাতে সেইখানে সমস্ত বাংলাদেশের একটি সাধারণ ভাষা আপনি জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহা ফরমাশে গড়া কৃত্রিম ভাষা নহে, তাহা জীবনের সংঘাতে প্রাণলাভ করিয়া সেই প্রাণের নিয়মেই বাড়িতেছে। আমাদের পাকযন্ত্রে নানা

খাদ্য আসিয়া রক্ত তৈরি হয়,তাহাকে বিশেষ করিয়া পাকযন্ত্রের রক্ত বলিয়া নিন্দা করা চলে না, তাহা সমস্ত দেহের রক্ত। রাজধানী জিনিসটা স্বভাবতই দেশের পাকযন্ত্র। এইখানে নানা ভাব, নানা বাণী এবং নানা শক্তির পরিপাক ঘটিতে থাকে এবং এই উপায়ে সমস্ত দেশ প্রাণ পায় ও ঐক্য পায়। রাগ করিয়া এবং ঈর্ষা করিয়া যদি বলি প্রত্যেক প্রদেশ আপন স্বতন্ত্র পাকযন্ত্র বহন করুক তবে আমাদের হাত-পা বুক-পিঠ বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বলিতে পারে আমাদের নিজের নিজের একটা করিয়া পাকযন্ত্র চাই। কিন্তু যতই রাগ করি আর তর্ক করি, সত্যের কাছে হার মানিতেই হয় এবং সেইজন্যই সংস্কৃত বাংলা আপনার খোলস ভাঙিয়া যে-ছাঁদে ক্রমশ প্রাকৃত বাংলার রূপ ধরিয়া উঠিতেছে সে-ছাঁদ ঢাকা বা বীরভূমের নয়। তার কারণ নানা প্রদেশের বাঙালি শিখিতে, আয় করিতে, ব্যয় করিতে, আমোদ করিতে, কাজ করিতে অনেক কাল হইতে কলিকাতায় আসিয়া জমা হইতেছে। তাহাদের সকলের সম্মিলনে যে এক-ভাষা গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই উপায়ে, অন্য দেশে যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি এখানেও একটি বিশেষ ভাষা বাংলাদেশের সমস্ত ভদ্রঘরের ভাষা হইয়া উঠিতেছে। ইহা কল্যাণের লক্ষণ। অবশ্য স্বভাবতই এই ভাষার ভূমিকা দক্ষিণ বাংলার ভাষায়। এইটুকু নম্রভাবে স্বীকার করিয়া না লওয়া সদ্‌-বিবেচনার কাজ নহে। ঢাকাতেই যদি সমস্ত বাংলার রাজধানী হইত তবে এতদিনে নিশ্চয়ই ঢাকার লোকভাষার উপর আমাদের সাধারণ ভাষার পত্তন হইত এবং তা লইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা যদি মুখ বাঁকা করিত তবে সে বক্রতা আপনিই সিধা হইয়া যাইত, মানভঞ্জনের জন্য অধিক সাধাসাধি করিতে হইত না।

এই যে বাংলাদেশের এক-ভাষা, আজকের দিনে যাহা অবাস্তব নহে, অথচ যাহাকে সাহিত্যে ব্যবহার করি না বলিয়া যাহার পরিচয় আমাদের কাছে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় নাই, যখনি শক্তিশালী সাহিত্যিকেরা এই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবেন তখনি ইহা পরিব্যক্ত হইয়া উঠিবে, সেটাতে কেবল ভাষার উন্নতি নয়, দেশের কল্যাণ।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটা যে তর্ক আছে সেটা একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা বাংলা-সাহিত্যে আজ যে-ভাষা ব্যবহার করিতেছি তার একটা বাঁধন পাকা হইয়া গেছে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই বাঁধনের প্রয়োজন আছে। নহিলে সাহিত্যে সংযম থাকে না। আবার শক্তি যাদের অল্প অসংযম তাদেরই বেশি। অতএব আমাদের যে চল্‌তি ভাষাকে সাহিত্যে নূতন করিয়া চালাইবার কথা উঠিয়াছে, তাহার আদব-কায়দা এখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই। অতএব এ ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। বস্তুত বর্তমানে এই চল্‌তি ভাষার লেখা, পুঁথির ভাষার লেখার চেয়ে অনেক শক্ত। বিধাতার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য থাকিবেই, এইজন্য ভদ্রতা সকলের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তাই অন্তত প্রথাগত ভদ্রতার বিধি যদি পাকা না হয় তবে সমাজ অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া উঠে। ‘সবুজ পত্র’-সম্পাদকের শাসনে আজকের দিনে বাংলাদেশের সকল লেখকই যদি চল্‌তি ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু করিয়া দেয় তবে সর্বপ্রথমে তাঁকেই কানে হাত দিয়া দেশছাড়া হইতে হইবে এ কথা আমি লিখিয়া দিতে পারি। অতএব সুখের বিষয় এই যে, এখনি এই দুর্যোগের সম্ভাবনা নাই। নূতনকে যারা বহন করিয়া আনে তারা যেমন বিধাতার সৈনিক, নূতনের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধরিয়া খাড়া হইয়া উঠে তারাও তেমনি বিধাতারই সৈন্য। কেননা প্রথমেই বিধানের সঙ্গে লড়াই করিয়া নূতনকে আপন রাজ্য গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু যতদিনে তার আপন বিধান পাকা না হইয়া উঠে ততদিনের অরাজকতা সামলাইবে কে?

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে সাহিত্যে আমরা যে-ভাষা ব্যবহার করি ক্রমে ক্রমে তার একটা বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায়। তার প্রধান কারণ সাহিত্যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিয়া চিন্তা করিতে এবং তাহা সম্পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদিগকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে এবং তাহা সরস করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রধানত নিত্যতার ক্ষেত্র। অতএব এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাছিতে সাজাইতে এবং বাজাইতে হয়। এইজন্যই স্বভাবতই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ এবং বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

আমার কথা এই, প্রতিদিনের যে-ভাষার খাদে আমাদের জীবনস্রোত বহিতে থাকে, সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার অভিমানে তাহা হইতে যত দূরে পড়ে ততই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে। চির-প্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হইলে তাহাকে এক দিকে সাধারণ, আর-এক দিকে বিশিষ্ট হইতে হইবে। সাহিত্যের বিশিষ্টতা তার সাধারণতাকে যখন ছাড়িয়া চলে তখন তার বিলাসিতা তার শক্তি ক্ষয় করে। সকল দেশের সাহিত্যেরই সেই বিপদ। সকল দেশেই বিশিষ্টতার বিলাসে ক্ষণে ক্ষণে সাহিত্য কৃত্রিমতার বন্ধ্যদশায় গিয়া উত্তীর্ণ হয়। তখন তাহাকে আবার কুলরক্ষার লোভ ছাড়িয়া প্রাণরক্ষার দিকে ঝোঁক দিতে হয়। সেই প্রাণের খোরাক কোথায়? সাধারণের ভাষার মধ্যে, যেখানে বিশ্বের প্রাণ আপনাকে মুহূর্তে মুহূর্তে প্রকাশ করিতেছে। ইংরেজি সাহিত্যিক ভাষা প্রথমে পণ্ডিতের ভাষা ল্যাটিন এবং রাজভাষা ফরাসির একটা কৌলীন্য খিচুড়ি ছিল, তার পরে কুল ছাড়িয়া যখন সে সাধারণের ঘরে আশ্রয় লইল তখনি সে ধ্রুব হইল। কিন্তু তার পরেও বারে বারে সে কৃত্রিমতার দিকে ঝুঁকিয়াছে। আবার তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাধারণের জাতে উঠিতে হইয়াছে। এমন-কি বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যেও সাধারণের পথে সাহিত্যের এই অভিসার দেখিতে পাই। বার্নার্ড্ শ, ওয়েল্স্, বেনেট্, চেস্টরটন্, বেলক প্রভৃতি আধুনিক লেখকগুলি হালকা চালের ভাষায় লিখিতেছেন।

আমাদের সাহিত্য যে-ভাষাবিশিষ্টতার দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে সেখান হইতে তাহাকে লোকালয়ের ভাষার মধ্যে নামাইয়া আনিবার জন্য ‘সবুজ পত্র’-সম্পাদক কোমর বাঁধিয়াছেন। তাঁর মত এই যে, সাহিত্য পদার্থটি আকারে সাধারণ এবং প্রকারে বিশিষ্ট—এই হইলেই সত্য হয়। এ কথা মানি। কিন্তু হিন্দুস্থানীতে একটা কথা আছে ‘পয়লা সামাল্না মুশকিল হ্যয়’। স্বয়ং বিধাতাও মানুষ গড়িবার গোড়ায় বানর গড়িয়াছেন, এখনো তাঁর সেই আদিম সৃষ্টির অভ্যাস লোকালয়ে সদাসর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গভাষা

বাংলা ভাষাতত্ত্ব যিনি আলোচনা করিতে চান, বীম্‌স্‌ সাহেবের তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং হ্যর্নলে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ তাঁহার পথ অনেকটা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে দুটো-একটা ভুল-ত্রুটি বা স্খলন বাহির করা গৌড়ী-ভাষীদের পক্ষে অসম্ভব না হইতে পারে কিন্তু যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি ও নম্রতার সহিত তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না।

সংসারে জড়পদার্থের রহস্য যথেষ্ট জটিল দুর্গম, কিন্তু সজীব পদার্থের রহস্য একান্ত দুরূহ। ভাষা একটা প্রকাণ্ড সজীব পদার্থ। জীবনধর্মের নিগূঢ় নিয়মে তাহার বিচিত্র শাখাপ্রশাখা কত দিকে কতপ্রকার অভাবনীয় আকার ধারণ করিয়া ব্যাপ্ত হইতে থাকে তাহার অনুসরণ করিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন। বীম্‌স্‌ সাহেব, হ্যর্নলে সাহেব, হিন্দি ব্যাকরণকার কেলগ সাহেব, মৈথিলী ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিয়র্সন সাহেব বিদেশী হইয়া ভারতবর্ষ-প্রচলিত আর্য ভাষার পথলুপ্ত অপরিচিত জটিল মহারণ্যতলে প্রবেশপূর্বক অশ্রান্ত পরিশ্রম এবং প্রতিভার বলে যে-সকল প্রচ্ছন্ন তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা লাভ করিয়া এবং বিশেষত তাঁহাদের আশ্চর্য অধ্যবসায় ও সন্ধানপরতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের স্বদেশী ভাষার সহিত সম্পর্কশূন্য স্বদেশহিতৈষী-আখ্যাধারীদের লজ্জা ও বিনতি অনুভব করা উচিত।

প্রাকৃত ভাষার সহিত বাংলার জন্মগত যোগ আছে সে-সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্রবাবু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল এবং ডাক্তার হ্যর্নলের সহিত একমত।

হ্যর্নলে সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে কথিত প্রাকৃত ভাষা দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। শৌরসেনী ও মাগধী। মহারাষ্ট্রী লিখিত ভাষা ছিল মাত্র এবং প্রাকৃত ভাষা ভারতবর্ষীয় অনার্যদের মুখে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া যে-

ভাষায় পরিণত হইয়াছিল তাহার নাম ছিল পৈশাচী।

প্রাচীন ব্যাকরণকারগণ যে-সকল ভাষাকে অপভ্রংশ ভাষা বলিতেন তাহাদের নাম এই আভীরী (সিন্ধি, মাড়োয়ারি), আবন্তী (পূর্ব-রাজপুতানি), গৌর্জরী (গুজরাটি), বাহ্লিকা (পঞ্জাবি), শৌরসেনী (পাশ্চাত্য হিন্দী), মাগধী অথবা প্রাচ্যা (প্রাচ্য হিন্দি), ওড্রী (উড়িয়া), গৌড়ী (বাংলা), দাক্ষিণাত্যা অথবা বৈদর্ভিকা (মারাঠি) এবং সৈপ্পলী (নেপালী?)।

উক্ত অপভ্রংশ তালিকার মধ্যে শৌরসেনী ও মাগধী নাম আছে কিন্তু মহারাষ্ট্রী নাম ব্যবহৃত হয় নাই। মহারাষ্ট্রী যে ভারতবর্ষীয় কোনো দেশ-বিশেষের কথিত ভাষা ছিল না তাহা হ্যর্নলে সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিশেষ আধুনিক মহারাষ্ট্রদেশ-প্রচলিত ভাষার অপেক্ষা পাশ্চাত্য হিন্দি ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য আছে। প্রাকৃত নাটকে দেখা যায় শৌরসেনী গদ্যাংশে এবং মহারাষ্ট্রী পদ্যাংশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা হইতেও কতকটা প্রমাণ হয় মহারাষ্ট্রী সাহিত্য-ভাষা ছিল, কথায়-বার্তায় তাহার ব্যবহার ছিল না।

কিন্তু, আমাদের মতে, ইহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, মহারাষ্ট্রী কোনো কালেই কথিত ভাষা ছিল না এবং তাহা সাহিত্যকারদের রচিত কৃত্রিম ভাষা। সর্বদা ব্যবহারের ঘর্ষণে চলিত কথায় ভাষার প্রাচীন রূপ ক্রমশ পরিবর্তিত হইতে থাকে, কিন্তু কাব্যে তাহা বহুকাল স্থায়িত্ব লাভ করে। বাহিরের বিচিত্র সংস্রবে পুরুষসমাজে যেমন ভাষা এবং প্রথার যতটা দ্রুত রূপান্তর ঘটে অন্তঃপুরের স্ত্রীসমাজে সেরূপ ঘটে না—কাব্যেও সেইরূপ। আমাদের বাংলা কাব্যের ভাষায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

বাংলা কাব্যে “ছিল” শব্দের স্থলে “আছিল”, প্রথম পুরুষ “করিল” শব্দের স্থলে “করিলা”, “তোমাদিগকে” স্থলে “তোমা সবে” প্রভৃতি যে-সকল রূপান্তর প্রচলিত আছে তাহাই যে কথিত বাংলার প্রাচীন রূপ ইহা প্রমাণ করা শক্ত নহে। এই দৃষ্টান্ত হইতেই সহজে অনুমান করা যায় যে, প্রাকৃত সাহিত্যে মহারাষ্ট্রী নামক পদ্য ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশ অপেক্ষা প্রাচীন আদর্শমূলক

হওয়া অসম্ভব নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শৌরসেনী-অপভ্রংশ প্রাকৃত-সাহিত্যের গদ্য ভাষা। সাহিত্য-প্রচলিত গদ্য ভাষার সহিত কথিত ভাষার সর্বাংশে ঐক্য থাকে না তাহাও বাংলা ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায়। একটা ভাষা যখন বহুবিস্তৃত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তখন তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেই–কিন্তু লিখিবার ভাষা নিয়মে এবং স্থায়ী আকারে বদ্ধ হইয়া দেশান্তর ও কালান্তরের বিকৃতি অনেকটা প্রত্যাখ্যানপূর্বক নানাস্থানীয় পণ্ডিতসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ও বোধগম্য হইয়া থাকে, এবং তাহাই স্বভাবত ভদ্রসমাজের আদর্শ ভাষারূপে পরিণত হয়। চট্টগ্রাম হইতে ভাগলপুর এবং আসামের সীমান্ত হইতে বঙ্গসাগরের তীর পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিচিত্ররূপ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু সাহিত্য-ভাষায় স্বতই একটি স্থির আদর্শ রক্ষিত হইয়া থাকে। সুন্দররূপে, সুশৃঙ্খলরূপে, সংহতরূপে, গভীররূপে ও সূক্ষ্মরূপে ভাবপ্রকাশের অনুরোধে এ ভাষা যে কতক পরিমাণে কৃত্রিম হইয়া উঠে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু এই সাহিত্যগত ভাষাকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক অপভাষার মূল আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে এইরূপ এক দিকে মাগধী ও অন্য দিকে শৌরসেনী মহারাষ্ট্রী এই দুই মূল প্রাকৃত ছিল। অদ্য ভারতবর্ষে যত আর্য ভাষা আছে তাহা এই দুই প্রাকৃতের শাখাপ্রশাখা।

এই দুই প্রাকৃতের মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর। এমন-কি হ্যর্নলে সাহেবের মতে এক সময়ে ভারতবর্ষে মাগধীই একমাত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল। তাহা পশ্চিম হইতে ক্রমে পূর্বাভিমুখে পরিব্যাপ্ত হয়। শৌরসেনী আর একটি দ্বিতীয় ভাষাপ্রবাহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পশ্চিমদেশ অধিকার করে। হ্যর্নলে সাহেব অনুমান করেন, ভারতবর্ষে পরে পরে দুইবার আর্য ঔপনিবেশিকগণ প্রবেশ করে। তাহাদের উভয়ের ভাষায় মূলগত ঐক্য থাকিলেও কতকটা প্রভেদ ছিল।

প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণ নিম্নলিখিত ভাষাগুলিকে মাগধী প্রাকৃতের শাখারূপে বর্ণনা করিয়াছেন—মাগধী, অর্ধমাগধী, দাক্ষিণাত্যা, উৎকলী এবং শাবরী। বেহার এবং বাংলার ভাষাকে মাগধীরূপে গণ্য করা যায়। মাগধীর সহিত শৌরসেনী বা মহারাষ্ট্রী মিশ্রিত হইয়া অর্ধমাগধীরূপ ধারণ করিয়াছে—ইহা যে মগধের পশ্চিমের ভাষা অর্থাৎ ভোজপুরী তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদর্ভ অর্থাৎ বেরার ও তাহার নিকটবর্তী প্রদেশের ভাষা দাক্ষিণাত্যা নামে অভিহিত। অতএব ইহাই বর্তমান মরাঠীস্থানীয়। উৎকলী উড়িষ্যার ভাষা, এবং এক দিকে দাক্ষিণাত্যা ও অন্য দিকে মাগধী ও উৎকলীর মাঝখানে শাবরী।

দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য হিন্দি, মৈথিলী, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রী এবং আসামি এইগুলিই বাংলার স্বজাতীয় ভাষা। আশ্চযের বিষয় এই যে, কাফিরিস্থানের কাফিরি ভাষা এবং আফগানিস্থানের পুশতু মাগধী প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত, এবং সে হিসাবে বাংলার কুটুম্বশ্রেণীয়। শৌরসেনী প্রাকৃত মাঝে পড়িয়া মাগধী প্রাকৃতের বিস্তারকে খণ্ডীকৃত করিয়া দিয়াছে।

এক্ষণে বাংলার ভাষাতত্ত্ব প্রকৃতরূপে নিরূপণ করিতে হইলে প্রাকৃত, পালি, প্রাচ্য হিন্দি, মৈথিলী, আসামি, উড়িয়া এবং মহারাষ্ট্রী ব্যাকরণ পর্যালোচনা ও তুলনা করিতে হয়।

কথাটা শুনিতে কঠিন, কিন্তু বাংলার ভাষাতত্ত্ব নির্ণয় জীবনের একটা প্রধান আলোচ্য-বিষয়রূপে গণ্য করিয়া লইলে এবং প্রত্যহ অন্তত দুই-এক ঘণ্টা নিয়মিত কাজ করিয়া গেলে এ কার্য একজনের পক্ষে অসাধ্য হয় না। বিশেষত উক্ত ভাষাকয়টির তুলনামূলক এবং স্বতন্ত্র ব্যাকরণ অনেকগুলিই পাওয়া যায়। এবং এইরূপ সম্পূর্ণ একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের গুটিকতক দৃষ্টান্ত না থাকিলে আমাদের বঙ্গসাহিত্য যথোচিত গৌরব লাভ করিতে পারিবে না।

বাংলার ভাষাতত্ত্ব-সন্ধানের একটি ব্যাঘাত, প্রাচীন পুঁথির দুষ্প্রাপ্যতা। কবিকঙ্কণচণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলি জনসাধারণের সমাদৃত হওয়াতে কালে কালে অল্পে অল্পে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়া

আসিয়াছে। প্রাচীন আদর্শ পুঁথি কোনো এক পুস্তকালয়ে যথাসম্ভব সংগৃহীত থাকিলে অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে সুবিধার বিষয় হয়। সাহিত্য-পরিষদের অধিকারে এইরূপ একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইতে পারিবে ইহাই আমরা আশা করি।

বাংলা ব্যাকরণের তির্যকরূপ

মারাঠি হিন্দি প্রভৃতি অধিকাংশ গৌড়ীয় ভাষায় শব্দকে আড় করিয়া বলিবার একটা প্রথা আছে। যেমন হিন্দিতে ‘কুত্তা’ সহজরূপ, ‘কুত্তে’ বিকৃতরূপ। ‘ঘোড়া’ সহজরূপ, ‘ঘোড়ে’ বিকৃতরূপ। মারাঠিতে ঘর ও ঘরা, বাপ ও বাপা, জিভ ও জিভে ইহার দৃষ্টান্ত।

এই বিকৃতরূপকে ইংরেজি পারিভাষিকে oblique from বলা হয়; আমরা তাহাকে তির্যক্‌রূপ নাম দিব।

অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষাতেও তির্যক্‌রূপের দৃষ্টান্ত আছে।

যেমন বাপা, ভায়া (ভাইয়া), চাঁদা, লেজা, ছাগলা, পাগলা, গোরা, কালা, আমা, তোমা, কাগাবগা (কাকবক), বাদলা বামনা, কোণা ইত্যাদি।

সম্ভবত প্রাচীন বাংলায় এই তির্যক্‌রূপের প্রচলন অধিক ছিল। তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত প্রাচীন বাক্য হইতে বুঝা যাইবে।

‘নরা গজা বিশে শয়।’

‘গণ’ শব্দের তির্যক্‌রূপ ‘গণা’ কেবলমাত্র ‘গণাগুষ্ঠি’ শব্দেই টিঁকিয়া আছে! ‘মুড়া’ শব্দের সহজরূপ ‘মুড়’ ‘মাথা-মোড় খোঁড়া’ ‘ঘাড়-মুড় ভাঙা’ ইত্যাদি

শব্দেই বর্তমান। যেখানে আমরা বলি 'গড়গড়া ঘুমচ্চে' সেখানে এই 'গড়া' শব্দকে 'গড়' শব্দের তির্যক্‌রূপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। 'গড় হইয়া প্রণাম করা' ও 'গড়ানো' ক্রিয়াপদে 'গড়' শব্দের পরিচয় পাই। 'দেব' শব্দের তির্যক্‌রূপ 'দেবা' ও 'দেয়া'। মেঘ ডাকা ও ভূতে পাওয়া সম্বন্ধে 'দেয়া' শব্দের ব্যবহার আছে। 'যেমন দেবা তেমনি দেবী' বাক্যে 'দেবা' শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলায় কাব্যভাষায় 'সব' শব্দের তির্যক্‌রূপ 'সবা' এখনো ব্যবহৃত হয়। যেমন আমাসবা, তোমাসবা, সবারে, সবাই। কাব্য-ভাষায় 'জন' শব্দের তির্যকরূপ 'জনা'। সংখ্যাবাচক বিশেষণের সঙ্গে 'জন' শব্দের যোগ হইলে চলিত ভাষায় তাহা অনেক স্থলেই 'জনা' হয়। একজনা, দুইজনা ইত্যাদি। 'জনাজনা' শব্দের অর্থ প্রত্যেক জন। আমরা বলিয়া থাকি 'একো জনা একো রকম'।

তির্যক্‌রূপে সহজরূপ হইতে অর্থের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা ঘটে এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। 'হাত' শব্দকে নির্জীব পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহার কালে তাহাকে তির্যক্‌ করিয়া লওয়া হইয়াছে, যেমন জামার হাতা, অথবা পাকশালার উপকরণ হাতা। 'পা' শব্দের সম্বন্ধেও সেইরূপ 'চৌকির পায়া'। 'পায়া ভারি' প্রভৃতি বিদ্রূপসূচক বাক্যে মানুষের সম্বন্ধে 'পায়া' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সজীব প্রাণী সম্বন্ধে যাহা খুর, খাট প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাই খুরা। কান শব্দ কলস প্রভৃতির সংস্রবে প্রয়োগ করিবার বেলা 'কানা' হইয়াছে। 'কাঁধা' শব্দও সেইরূপ।

খাঁটি বাংলা ভাষার বিশেষণপদগুলি প্রায়ই হলন্ত নহে এ কথা রামমোহন রায় তাঁহার বাংলা ব্যাকরণে প্রথম নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত শব্দ 'কাণ' বাংলায় তাহা 'কানা'। সংস্কৃত 'খঞ্জ' বাংলায় 'খোঁড়া'। সংস্কৃত 'অর্ধ' বাংলা 'আধা'। শাদা, রাঙা, বাঁকা, কালা, খাঁদা, পাকা, কাঁচা, মিঠা ইত্যাদি বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। 'আলো' বিশেষ্য, 'আলা' বিশেষণ। 'ফাঁক' বিশেষ্য 'ফাঁকা' বিশেষণ। 'মা' বিশেষ্য, 'মায়্যা (মায়্যা মানুষ) বিশেষণ। এই আকার প্রয়োগের দ্বারা বিশেষণ নিষ্পন্ন করা ইহাও বাংলা ভাষায় তির্যক্‌রূপের দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

মারাঠিতে তির্যক্‌রূপে আকার ও একার দুই স্বরবর্ণের যেমন ব্যবহার দেখা যায় বাংলাতেও সেইরূপ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে আকারের ব্যবহার বিশেষ কয়েকটি মাত্র শব্দে বদ্ধ হইয়া আছে; তাহা সজীব ভাবে নাই, কিন্তু একারের ব্যবহার এখনো গতিবিশিষ্ট। ‘পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়’ এই বাক্যে ‘পাগলে’ ও ‘ছাগলে’ শব্দে যে একার দেখিতেছি তাহা উক্ত প্রকার তির্যক্‌রূপের একার। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর তির্যক্‌রূপ কোন্ কোন্ স্থলে ব্যবহৃত হয় আমরা তাহার আলোচনা করিব।

সামান্য বিশেষ্য : বাংলায় নাম সংজ্ঞা (proper names) ছাড়া অন্যান্য বিশেষ্যপদে যখন কোনো চিহ্ন থাকে না, তখন তাহাদিগকে সামান্য বিশেষ্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যেমন, বানর, টেবিল, কলম, ছুরি ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিশেষ্যপদগুলির দ্বারা সাধারণভাবে সমস্ত বানর, টেবিল, চৌকি, ছুরি বুঝাইতেছে, কোনো বিশেষ এক বা একাধিক বানর, টেবিল, চৌকি, ছুরি বুঝাইতেছে না বলিয়াই ইহাদিগকে সামান্য বিশেষ্য পদ নাম দেওয়া হইয়াছে। বলা আবশ্যক ইংরেজি common names ও বাংলা সামান্য বিশেষ্যে প্রভেদ আছে। বাংলায় আমরা যেখানে বলি ‘এইখানে ছাগল আছে’ সেখানে ইংরেজিতে বলে ‘There is a goat here’ কিংবা ‘There are goats here’। বাংলায় এ স্থলে সাধারণভাবে বলা হইতেছে ছাগলজাতীয় জীব আছে। তাহা কোনো একটি বিশেষ ছাগল বা বহু ছাগল তাহা নির্দেশ করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই, কিন্তু ইংরেজিতে এরূপ স্থলেও বিশেষ্যপদকে article-যোগে বা বহুবচনের চিহ্নযোগে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। ইংরেজিতে যেখানে বলে ‘There is a bird in the cage’ বা ‘There are birds in the cage’ আমরা উভয় স্থলেই বলি ‘খাঁচায় পাখি আছে’—কারণ এ স্থলে খাঁচার পাখি এক কিংবা বহু তাহা বক্তব্য নহে কিন্তু খাঁচার মধ্যে পাখি নামক পদার্থ আছে ইহাই বক্তব্য। এই কারণে, এ-সকল স্থলে বাংলায় সামান্য বিশেষ্যপদই ব্যবহৃত হয়।

এই সামান্য বিশেষ্যপদ যখন জীববাচক হয় প্রায় তখনই তাহা তির্যকরূপ

গ্রহণ করে। কখনো বলি না, ‘গাছে নড়ে’, বলি ‘গাছ নড়ে’। কিন্তু ‘বানরে লাফায়’ বলিয়া থাকি। কেবল কর্তৃকারকেই এই শ্রেণীর তির্যক্‌রূপের প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু তাহার বিশেষ নিয়ম আছে।

প্লেগে ধরে বা ম্যালেরিয়ায় ধরে—এরকম স্থলে প্লেগ ও ম্যালেরিয়া বস্তুত অচেতন পদার্থ। কিন্তু আমরা বলিবার সময় উহাতে চেতনতা আরোপ করিয়া উহাকে আক্রমণ ক্রিয়ার সচেষ্ট কর্তা বলিয়াই ধরি। তাই উহা রূপকভাবে চেতন বাচকের পর্যায় স্থান লাভ করিয়া তির্যক্‌রূপ প্রাপ্ত হয়।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে সকর্মক ক্রিয়ার সহযোগেই জীববাচক সামান্য বিশেষ্যপদ কর্তৃকারকে তির্যক্‌রূপ ধারণ করে। ‘এই ঘরে ছাগলে আছে’ বলি না কিন্তু ‘ছাগলে ঘাস খায়’ বলা যায়। বলি ‘পোকায় কেটেছে’, কিন্তু অকর্মক ‘লাগা’ ক্রিয়ার বেলায় ‘পোকা লেগেছে’। ‘তাকে ভূতে পেয়েছে’ বলি, ‘ভূত পেয়েছে’ নয়। পাওয়া ক্রিয়া সকর্মক।

কিন্তু এই সকর্মক ও অকর্মক শব্দটি এখানে সম্পূর্ণ খাটিবে না। ইহার পরিবর্তে বাংলায় নূতন শব্দ তৈরি করা আবশ্যক। আমরা এ স্থলে ‘সচেষ্টক’ ও ‘অচেষ্টক’ শব্দ ব্যবহার করিব। কারণ প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে সকর্মক ক্রিয়ার সংস্রবে উহ্য বা ব্যক্তভাবে কর্ম থাকা চাই কিন্তু আমরা যে শ্রেণীর ক্রিয়ার কথা বলিতেছি তাহার কর্ম না থাকিতেও পারে। ‘বানরে লাফায়’ এই বাক্যে ‘বানর’ শব্দ তির্যক্‌রূপ গ্রহণ করিয়াছে, অথচ ‘লাফায়’ ক্রিয়ার কর্ম নাই। কিন্তু ‘লাফানো’ ক্রিয়াটি সচেষ্টক।

‘আছে’ এবং ‘থাকে’ এই দুইটি ক্রিয়ার পার্থক্য চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ‘আছে’ ক্রিয়াটি অচেষ্টক কিন্তু ‘থাকে’ ক্রিয়া সচেষ্টক—সংস্কৃত ‘অস্তি’ এবং ‘তিষ্ঠতি’ ইহার প্রতিশব্দ। ‘আছে’ ক্রিয়ার কর্তৃকারকে তির্যক্‌রূপ স্থান পায় না—‘ঘরে মানুষে আছে’ বলা চলে না কিন্তু ‘এ ঘরে কি মানুষে থাকতে পারে’ এরূপ প্রয়োগ সংগত।

‘প্লেগে স্ত্রীলোকেই অধিক মরে’ এ স্থলে মরা ক্রিয়া অচেষ্টক সন্দেহ নাই। ‘বেশি আদর পেলে ভালো মানুষেও বিগড়ে যায়’ ‘অধ্যবসায়ের দ্বারা মূর্খেও পণ্ডিত হ’তে পারে’, ‘অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কায় বীরপুরুষেও ভীত হয়’ এ-সকল অচেষ্টক ক্রিয়ার দৃষ্টান্তে আমার নিয়ম খাটে না। বস্তুত এই নিয়মে ব্যতিক্রম যথেষ্ট আছে। কিন্তু ‘আছে’ ক্রিয়ার স্থলে কর্তৃপদে একার বসে না, এ নিয়মের ব্যতিক্রম এখনো ভাবিয়া পাই নাই।

আসা এবং যাওয়া ক্রিয়াটি যদিও সাধারণত সচেষ্টক, তবু তাহাদের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত নিয়মটি ভালোরূপে খাটে না। আমরা বলি ‘সাপে কামড়ায়’ বা ‘কুকুরে আঁচড়ায়’ কিন্তু ‘সাপে আসে’ বা ‘কুকুরে যায়’ বলি না। অথচ ‘যাতায়াত করা’ ক্রিয়ার অর্থ যদিচ যাওয়া আসা করা, সেখানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। আমরা বলি এ পথ দিয়ে মানুষে যাতায়াত করে, বা ‘যাওয়া আসা করে’ বা ‘আনাগোনা করে’। কারণ, ‘করে’ ক্রিয়াযোগে আসা যাওয়াটা নিশ্চিতভাবেই সচেষ্টক হইয়াছে। ‘খেতে যায়’ বা ‘খেতে আসে’ প্রভৃতি সংযুক্ত ক্রিয়াপদেও এ নিয়ম অব্যাহত থাকে—যেমন, ‘এই পথ দিয়ে বাঘে জল খেতে যায়’।

‘সকল’ ও ‘সব’ শব্দ সচেষ্টক অচেষ্টক উভয় শ্রেণীর ক্রিয়া-সহযোগেই তির্যক্‌রূপ লাভ করে। যথা, এ ঘরে সকলেই আছেন বা সবাই আছে।

ইহার কারণ এই যে, ‘সকল’ ও ‘সব’ শব্দ দুটি বিশেষণপদ। ইহারা তির্যক্‌রূপ ধারণ করিলে তবেই বিশেষ্যপদ হয়। ‘সকল’ ও ‘সব’ শব্দটি হয় বিশেষণ, নয় অন্য শব্দের যোগে বহুবচনের চিহ্ন—কিন্তু ‘সকলে’ বা ‘সবে’ বিশেষ্য। কথিত বাংলায় ‘সব’ শব্দটি বিশেষ্যরূপ গ্রহণকালে দ্বিগুণভাবে তির্যক্‌রূপ প্রাপ্ত হয়—প্রথমত ‘সব’ হইতে হয় ‘সবা’ তাহার পরে পুনশ্চ তাহাতে এ যোগ হইয়া হয় ‘সবাএ’। এই ‘সবাএ’ শব্দকে আমরা ‘সবাই’ উচ্চারণ করিয়া থাকি।

‘জন’ শব্দ ‘সব’ শব্দের ন্যায়। বাংলায় সাধারণত ‘জন’ শব্দ বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হয়। একজন লোক, দুজন মানুষ ইত্যাদি। বস্তুত মানুষের পূর্বে সংখ্যা

যোগ করিবার সময় আমরা তাহার সঙ্গে ‘জন’ শব্দ যোজনা করিয়া দিই। পাঁচ মানুষ কখনোই বলি না, পাঁচজন মানুষ বলি। কিন্তু এই ‘জন’ শব্দকে যদি বিশেষ্য করিতে হয় তবে ইহাকে তির্যক্‌রূপ দিয়া থাকি। দুজনে, পাঁচজনে ইত্যাদি। ‘সবাএ’ শব্দের ন্যায় ‘জনাএ’ শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে—এক্ষণে ইহা ‘জনায়’ রূপে লিখিত হয়।

বাংলায় ‘অনেক’ শব্দটি বিশেষণ। ইহাও বিশেষ্যরূপ গ্রহণকালে ‘অনেকে’ হয়। সর্বত্রই এ নিয়ম খাটে। ‘কালোএ’ (কালোয়) যার মন ভুলেছে ‘শাদাএ’ (শাদায়) তার কি করবে। এখানে কালো ও শাদা বিশেষণপদ তির্যক্‌রূপ ধরিয়া বিশেষ্য হইয়াছে। ‘অপর’ ‘অন্য’ শব্দ বিশেষণ কিন্তু ‘অপরে’ ‘অন্যে’ বিশেষ্য। ‘দশ’ শব্দ বিশেষণ, ‘দশে’ বিশেষ্য (দশে যা বলে)।

নামসংজ্ঞা সম্বন্ধে এ-প্রকার তির্যক্‌রূপ ব্যবহার হয় না—কখনো বলি না, ‘যাদবে ভাত খাচ্চে’। তাহার কারণ পূর্বেই নির্দেশ করা হইয়াছে, বিশেষ নাম কখনো সামান্য বিশেষ্যপদ হইতে পারে না। বাংলায় একটি প্রবাদবাক্য আছে ‘রামে মারলেও মরব রাবণে মারলেও মরব।’ বস্তুত এখানে ‘রাম’ ও রাবণ’ সামান্য বিশেষ্যপদ-এখানে উক্ত দুই শব্দের দ্বারা দুই প্রতিপক্ষকে বুঝাইতেছে। কোনো বিশেষ রাম-রাবণকে বুঝাইতেছে না।

তির্যক্‌রূপের মধ্যে প্রায়ই একটি সমষ্টিবাচকতা থাকে। যথা ‘আত্মীয়ে তাকে ভাত দেয় না।’ এখানে আত্মীয় সমষ্টিই বুঝাইতেছে। এইরূপ ‘লোকে বলে।’ এখানে লোকে’ অর্থ সর্বসাধারণে। ‘লোক বলে’ কোনোমতেই হয় না। সমষ্টি যখন বুঝায় তখন ‘বানরে বাগান নষ্ট করিয়াছে’ ইহাই ব্যবহার্য—‘বানর করিয়াছে’ বলিলে বানর দল বুঝাইবে না।

সংখ্যা-সহযোগে বিশেষ্যপদ যদিচ সামান্যতা পরিহার করে তথাপি সকর্মক রূপে তাহাদের প্রতিও একার প্রয়োগ হয়, যেমন ‘তিন শেয়ালে যুক্তি করে গর্তে ঢুকল’, এমন—কি ‘আমরা’ ‘তোমরা’ ‘তারা’ ইত্যাদি সর্বনাম বিশেষণের দ্বারা বিশেষ্যপদ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইলেও সংখ্যার সংস্রবে তাহার

তির্যক্‌রূপ গ্রহণ করে। যেমন, ‘তোমরা দুই বন্ধুতে’ ‘সেই দুটো কুকুরে’ ইত্যাদি।

অনেকের মধ্যে বিশেষ একাংশ যখন এমন কিছু করে অপরাংশ যাহা করে না তখন কর্তৃপদে তির্যক্‌রূপ ব্যবহার হয়। যথা ‘তাদের মধ্যে দুজনে গেল দক্ষিণে’–এরূপ বাক্যের মধ্যে একটি অসমাপ্তি আছে। অর্থাৎ আর কেহ আর কোনো দিকে গিয়াছে বা বাকি কেহ যায় নাই এরূপ বুঝাইতেছে। যখন বলি ‘একজনে বললে হাঁ’ তখন ‘আর-একজন বললে না’ এমন আর-একটা কিছু শুনিবার অপেক্ষা থাকে। কিন্তু যদি বলা যায় ‘একজন বললে, হাঁ’ তবে সেই সংবাদই পর্যাপ্ত।

তির্যক্‌রূপে হলন্ত শব্দে একার যোজনা সহজ, যেমন বানর বানরে। (বাংলায় বানর শব্দ হলন্ত)। অকারান্ত, আকারান্ত এবং ওকারান্ত শব্দের সঙ্গেও ‘এ’ যোজনায় বাধা নাই–‘ঘোড়াএ’ (ঘোড়ায়) ‘পেঁচোএ’ (পেঁচোয়) ইত্যাদি। এতদ্‌ব্যতীত অন্য স্বরান্ত শব্দে ‘এ’ যোগ করিতে হইলে ‘ত’ ব্যঞ্জনবর্ণকে মধ্যস্থ করিতে হয়। যেমন ‘গোরুতে’, ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের শেষে যখন ব্যঞ্জনকে আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধ স্বর থাকে তখন ‘ত’কে মধ্যস্থরূপে প্রয়োজন হয় না। যেমন উই, উইএ (উইয়ে), বউ, বউএ (বউয়ে) ইত্যাদি। এ কথা মনে রাখা আবশ্যক বাংলায় বিভক্তিরূপে যেখানে একার প্রয়োগ হয় সেখানে প্রায় সর্বত্রই বিকল্পে ‘তে’ প্রয়োগ হইতে পারে। এইজন্য ‘ঘোড়ায় লাথি মেরেছে’, এবং ‘ঘোড়াতে লাথি মেরেছে’ দুইই হয়। ‘উইয়ে নষ্ট করেছে’, এবং ‘উইতে’ বা ‘উইয়েতে’ নষ্ট করেছে।’ হলন্ত শব্দে এই ‘তে’ বিভক্তি গ্রহণকালে তৎপূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে পুনশ্চ একার যোগ করিতে হয়। যেমন ‘বানরেতে’, ‘ছাগলেতে’।

বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য-১

আমরা পূর্বে এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, বাংলায় নামসংজ্ঞা ছাড়া বিশেষ্যপদবাচক শব্দ মাত্রই সহজ অবস্থায় সামান্য বিশেষ্য। অর্থাৎ তাহা জাতিবাচক। যেমন শুধু ‘কাগজ’ বলিলে বিশেষভাবে একটি বা অনেকগুলি কাগজ বোঝায় না, তাহার দ্বারা সমস্ত কাগজকেই বোঝায়।

এমন স্থলে যদি কোনো বিশেষ কাগজকে আমরা নির্দেশ করিতে চাই তবে সেজন্য বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা আবশ্যক হয়।

ইংরেজি ব্যাকরণে এইরূপ নির্দেশক চিহ্নকে Article বলে। বাংলাতেও এই শ্রেণীর সংকেত আছে। সেই সংকেতের দ্বারা সামান্য বিশেষ্যপদ একবচন ও বহুবচন রূপ ধারণ করিয়া বিশেষ বিশেষ্যে পরিণত হয়। এই কথা মনে রাখা কর্তব্য, বিশেষ্যপদ, একবচন বা বহুবচনরূপ গ্রহণ করিলেই, সামান্যতা পরিহার করে। একটি ঘোড়া বা তিনটি ঘোড়া বলিলেই ঘোড়া শব্দের জাতিবাচক অর্থ সংকীর্ণ হইয়া আসে—তখন বিশেষ এক বা একাধিক ঘোড়া বোঝায়—সুতরাং তখন তাহাকে সামান্য বিশেষ্য না বলিয়া বিশেষ বিশেষ্য বলাই উচিত। এই কথা চিন্তা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন আমাদের সামান্য বিশেষ্য এবং ইংরেজি Common name এক নহে।

বিশেষ বিশেষ্য একবচন মোটামুটি বলা যাইতে পারে বাংলার নির্দেশক চিহ্নগুলি শব্দের পূর্বে না বসিয়া শব্দের পরেই যোজিত হয়। ইংরেজি ‘the room’—বাংলায় ‘ঘরটি’। এখানে ‘টি’ নির্দেশক চিহ্ন।

টি ও টা

ইংরেজিতে the আর্টিক্‌ল্‌ একবচন এবং বহুবচন উভয়ত্রই বসে কিন্তু বাংলায় টি ও টা সংকেতের দ্বারা একটিমাত্র পদার্থকে বিশিষ্ট করা হয়। যখন বলা হয়,

‘রাস্তা কোন্ দিকে’ তখন সাধারণভাবে পথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়—যখন বলি, ‘রাস্তাটা কোন্ দিকে’—তখন বিশেষ একটা রাস্তা কোন্ দিকে সেই সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হয়।

ইংরেজিতে ‘the’ শব্দের প্রয়োগ যত ব্যাপক বাংলায় ‘টি’ তেমন নহে। আমাদের ভাষায় এই প্রয়োগ সম্বন্ধে মিতব্যয়িতা আছে। সেইজন্যে যখন সাধারণভাবে আমরা খবর দিতে চাই, মধু বাহিরে নাই,তখন আমরা শুধু বলি, মধু ঘরে আছে—ঘর শব্দের সঙ্গে কোনো নির্দেশক চিহ্ন যোজনা করি না। কারণ ঘরটাকেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই।

১ বাংলা ব্যকরণে তির্যকরূপ নামক প্রবন্ধে, বাংলায় বিশেষ বিশেষ স্থলে কর্তৃকারকে একারযোগে যে রূপ হয় তাহাকে তির্যকরূপ নাম দিয়াছিলাম। তাহাতে কোনো পাঠক আপত্তি প্রকাস করিয়াছেন। তিনি বলেন ইহাকে বলা উচিত কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি। নাম লইয়া তর্ক নিষ্ফল। নাহয় নাই বলিলাম ‘তির্যকরূপ’—নাহয় আর-কোনো নাম দেওয়া গেল। আমার বক্তব্য এই ছিল যে, কোনো কোনো স্থলে বাংলা বিশেষ্যপদ তাহার সহজরূপ পরিত্যাগ করে। তাহার এই রূপের বিকারকেই অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার সহিত তুলনা করিয়া ‘তির্যক্যরূপ’ নাম দিয়াছিলাম। ঘোড়ে, কুত্তে প্রভৃতি হিন্দি তির্যকর রূপের দৃষ্টান্ত; ঘোড়্েওয়া কাহারওয়া প্রভৃতি শব্দ নহে— অনন্ত তুলনামূলক ব্যকরণবিদ্গাপণ শেষোক্তগুলিকে তির্যক। রূপের দৃষ্টান্ত বলিয়া ব্যবহার করেন নাই। দ্বিতীয় কথা এই— বাংলা কর্তৃকারকের একার-সংযুক্ত রূপকে যদি সংস্কৃত কোনো বিভক্তির নাম দিতেই হয় তবে আমার মতে তাহা সপ্তমী নহে তৃতীয়া। বাংলা ‘বাঘে খাইল’ বাক্যটি সংস্কৃত ‘ব্যাঘ্রেণ খাদিতঃ’ বাক্য হইতে উৎপন্ন এমন অনুমান করা যাইতেও পারে। যাহাই হউক এ-সকল অনুমানের কথা আমার সে প্রবন্ধে আসল কথাটা ব্যকরণের নাম নহে, ব্যকরণের নিয়ম।

ইংরাজিতে এ স্থলেও ‘the room’ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কোনো একটি বিশেষ ঘরে মধু আছে এই সংবাদটি দিবার প্রয়োজন ঘটে তখন আমরা বলি, ঘরটাতে মধু আছে। এইরূপ, যে বাক্যে একাধিক বিশেষ্যপদ আছে তাহাদের

মধ্যে বক্তা যেটিকে বিশেষভাবে নির্দেশ করিতে চান সেইটির সঙ্গেই নির্দেশক যোজনা করেন। যেমন, গোরুটা মাঠে চরছে, বা মাঠটাতে গরু চরছে। জাজিমটা ঘরে পাতা, বা ঘরটাতে জাজিম পাতা। ‘আমার মন খারাপ হয় গেছে’ বা ‘আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে’-দুইই আমরা বলি। প্রথম বাক্যে, মন খারাপ হওয়া ব্যাপারটাই বলা হইতেছে–দ্বিতীয় বাক্যে, আমার মনই যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহার উপরেই ঝোঁক।
‘টি’ সংকেতটি ছোটো আয়তনের জিনিস ও আদরের জিনিস সম্বন্ধে ‘টা’ বড়ো জিনিস সম্বন্ধে বা অবজ্ঞা কিংবা অপ্রিয়তা বুঝাইবার স্থলে বসে। যে পদার্থ সম্বন্ধে আদর বা অনাদর কিছুই বোঝায় না, তৎসম্বন্ধেও ‘টা’ প্রয়োগ হয়। ‘ছাতাটি কোথায়’ এই বাক্যে ছাতার প্রতি বক্তার একটু যত্ন প্রকাশ হয়, কিন্তু ‘ছাতাটা কোথায়’ বলিলে যত্ন বা অযত্ন কিছুই বোঝায় না।

সাধারণত নামসংজ্ঞার সহিত ‘টা’ ‘টি’ বসে না। কিন্তু বিশেষ কারণে ঝোঁক দিতে হইলে নামসংজ্ঞার সঙ্গেও নির্দেশক বসে। যেমন, হরিটা বাড়ি গেছে। সম্ভবত হরির বাড়ি যাওয়া বক্তার পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই, টা তাহাই বুঝাইল। ‘রামটি মারা গেছে’, এখানে বিশেষভাবে করুণা প্রকাশের জন্য টি বসিল। এইরূপ শ্যামটা ভারি দুষ্ট, শৈলটি ভারি ভালো মেয়ে। এইরূপে টি ও টা অনেক স্থলে বিশেষ পদের সঙ্গে বক্তার হৃদয়ের সুর মিশাইয়া দেয়। বলা আবশ্যক মান্য ব্যক্তির নাম সম্বন্ধেও টি বা টা ব্যবহার হয় না।

সামান্যতাবাচক বা সমষ্টিবাচক বিশেষ্যপদকে বিশেষভাবে নির্দেশ করিতে হইলে নির্দেশক প্রয়োগ করা যায়। যেমন, ‘গিরিডির কয়লাটা ভালো’, ‘বেহারের মাটিটা উর্বরা’, ‘এখানে মশাটা বড়ো বেশি’, ‘ভীম নাগ সন্দেশটা করে ভালো’। কিন্তু শুদ্ধ অস্তিত্ব জ্ঞাপনের সময় এরূপ প্রয়োগ খাটে না; বলা যায় না, ‘ভীমের দোকানে সন্দেশটা আছে।’

এখানে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যখন বলা যায় ‘বেহারের মাটিটা উর্বরা’ বা ‘ভীমের দোকানের সন্দেশটা ভালো’ তখন প্রশংসা সূচনা সত্ত্বেও ‘টা’ নির্দেশক ব্যবহার হয় তাহার কারণ এই যে, এই

বিশেষ্যপদগুলিতে যে-সকল বস্তু বুঝাইতেছে তাহা পরিমাণে অল্প নহে।

যখন আমরা কর্তৃবাচক বিশেষ্যকে সাধারণভাবে উল্লেখ করিয়া পরিচয়বাচক বিশেষ্যকে বিশেষভাবে নির্দেশ করি, তখন শেষোক্ত বিশেষ্যের সহিত নির্দেশক যোগ হয়। যেমন, ‘হরি মানুষটা ভালো’, ‘বাঘ জন্তুটা ভীষণ’।

সাধারণত গুণবাচক বিশেষ্যে নির্দেশক যোগ হয় না–বিশেষত শুদ্ধমাত্র অস্তিত্ব জ্ঞাপনকালে তো হয়ই না। যেমন, আমরা বলি, ‘রামের সাহস আছে।’ কিন্তু ‘রামের সাহসটা কম নয়’, ‘উমার লজ্জাটা বেশি’ বলিয়া উমার বিশেষ লজ্জা ও রামের বিশেষ সাহসের উল্লেখকালে টা প্রয়োগ করি।

ইংরেজিতে ‘this’ ‘my’ প্রভৃতি সর্বনাম বিশেষণপদ থাকিলে বিশেষ্যের পূর্বে আর্টিক্‌ল্‌ বসে না কিন্তু বাংলায় তাহার বিপরীত। এরূপ স্থলে বিশেষ করিয়াই নির্দেশক বসে। যেমন, ‘এই বইটা’, আমার কলমটি’।

বিশেষণপদের সঙ্গে ‘টা’ ‘টি’ যুক্ত হয় না। যদি যুক্ত হয় তবে তাহা বিশেষ্য হইয়া যায়। যেমন, ‘অনেকটা নষ্ট হয়েছে’, ‘অর্ধেকটা রাখো’, ‘একটা দাও’, ‘আমারটা লও’, ‘তোমরা কেবল মন্দটাই দেখো’ ইত্যাদি।

নির্দেশক-চিহ্ন-যুক্ত বিশেষ্যপদে কারকের চিহ্নগুলি নির্দেশকের সহিত যুক্ত হয়। যেমন, ‘মেয়েটির’, ‘লোকটাকে’, ‘বাড়িটাতে’ ইত্যাদি।

অচেতন পদার্থবাচক বিশেষ্যপদে কর্মকারকে ‘কে’ বিভক্তিচিহ্ন প্রায় বসে না। কিন্তু ‘টি’ ‘টা’-র সহযোগে বসিতে পারে। যেমন, ‘লোহাটাকে’, ‘টেবিলটিকে’ ইত্যাদি।

ক্রোশটাক্‌ সেরটাক্‌ প্রভৃতি দূরত্ব ও পরিমাণ-বাচক শব্দের ‘টাক্‌’ প্রত্যয়টি টা ও এক শব্দের সন্ধিজাত। কিন্তু এই ‘টাক্‌’ প্রত্যয়যোগে উক্ত শব্দগুলি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন ক্রোশটাক্‌ পথ, সেরটাক্‌ দুধ ইত্যাদি। কেহ

কেহ মনে করেন এগুলি বিশেষণ নহে। কারণ, বিশেষ্য ভাবেও উহাদের প্রয়োগ হয়। যেমন, ‘ক্রোশটাক্ গিয়েই বসে পড়ল’, ‘পোয়াটাক্ হলেই চলবে’।
যদিচ সাধারণত টি টা প্রভৃতি নির্দেশক সংকেত বিশেষণের সহিত বসে না, তবু এক স্থলে তাহার ব্যতিক্রম আছে। সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত নির্দেশক যুক্ত হইয়া বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, একটা গাছ, দুইটি মেয়ে ইত্যাদি।

বাংলায় ইংরেজি Indefinite article-এর অনুরূপ শব্দ, একটি, একটা। একটা মানুষ বলিলে অনির্দিষ্ট কোনো একজন মানুষ বুঝায়। ‘একটা মানুষ ঘরে এল’ এবং ‘মানুষটা ঘরে এল’ এই দুই বাক্যের মধ্যে অর্থভেদ এই–প্রথম বাক্যে যে হউক একজন মানুষ ঘরে আসিল এই তথ্য বলা হইতেছে, দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষ কোনো একজন মানুষের কথা বলা হইতেছে।

কিন্তু ‘একটা’ বা ‘একটি’ যখন বিশেষভাবে এক সংখ্যাকে জ্ঞাপন করে তখন তাহাকে indefinite বলা চলে না। ইংরেজিতে তাহার প্রতিশব্দ one। সেখানে একটা লোক মানে এক সংখ্যক লোক, কোনো একজন অনির্দিষ্ট লোক নহে।

যেখানে ‘এক’ শব্দটি অপর একটি বিশেষণের পরে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় সেখানে সাধারণত ‘টি’ ‘টা’ প্রয়োগ চলে না, যেমন, লম্বা-এক ফর্দ, মস্ত-এক বাবু, সাতহাত-এক লাঠি।

বলা বাহুল্য, এক ভিন্ন অন্য সংখ্যা সহযোগে যেখানে টি, টা বসে সেখানে তাহাকে Indefinite article-এর সহিত তুলনীয় করা চলে না, সেখানে তাহা সংখ্যাবাচক বিশেষণ।

খানি, খানা প্রভৃতি আরো কয়েকটি নির্দেশক চিহ্ন আছে, তাহাদের কথা পরে হইবে।

বলা আবশ্যক সংস্কৃতের অনুকরণ করিতে গিয়া বাংলা লিখিত ভাষায় নির্দেশক সংকেতের ব্যবহার বিরল হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত রীতির পক্ষপাতী তাঁহাদের রচনায় ইহা প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেহেতু বাংলায় বক্তা ইচ্ছা করিলে কোনো একটি বিশেষ্যপদকে বিশেষভাবে নির্দেশ করিতেও পারেন নাও করিতে পারেন সেইজন্য ইহাকে বর্জন করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক রীতিকে ত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে দুর্বল করা হয়। আধুনিক কালের লেখকগণ মাতৃভাষার সবস্ত স্বকীয় সম্পদগুলিকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়া ক্রমশই ভাষাকে প্রাণপূর্ণ ও বেগবান করিয়া তুলিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংলা নির্দেশক

আমরা বাংলা ভাষার নির্দেশক চিহ্ন ‘টি’ ও ‘টা’ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই শ্রেণীর সংকেত আরো কয়েকটি আছে।

খানি ও খানা

বাংলা ভাষায় ‘গোটা’ শব্দের দ্বারা অখণ্ডতা বুঝায়। এই কারণে, এই ‘গোটা’ শব্দেরই অপভ্রংশ ‘টা’ চিহ্ন পদার্থের সমগ্রতা সূচনা করে। হরিণটা, টেবিলটা, মাঠটা, শব্দে একটা সমগ্র পদার্থ বুঝাইতেছে।

বাংলা ভাষার অপর একটি একত্ব নির্দেশক চিহ্ন খানা, খানি। ‘খণ্ড’ শব্দ হইতে উহার উৎপত্তি। এখনো বাংলায় ‘খান্ খান্’ শব্দের দ্বারা খণ্ড খণ্ড বুঝায়।

ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, এক-একটি সমগ্র বস্তুকে বুঝাইতে ‘টা’ চিহ্নের প্রয়োগ এবং এক-একটি খণ্ডকে বুঝাইতে ‘খানা’ চিহ্নের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

গোড়ায় কী ছিল বলিতে পারি না, এখন কিন্তু এরূপ দেখা যায় না। আমরা বলি কাগজখানা, শ্লেটখানা। এই কাগজ ও শ্লেট সমগ্র পদার্থ হইলেও আসে যায় না।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যে-সকল সামগ্রী দীর্ঘ প্রস্থ বেধে সম্পূর্ণ, সাধারণত তাহাদের সম্বন্ধে ‘খানা’ ব্যবহার হয় না। যে জিনিসকে প্রস্থের প্রসারের দিক হইতেই দেখি, লম্বের বা বেধের দিক হইতে নয় প্রধানত তাহারই সম্বন্ধে ‘খানা’ ও ‘খানি’র যোগ। মাঠখানা, ক্ষেতখানা; কিন্তু পাহাড়খানা নদীখানা নয়। থালখানা, খাতাখানা; কিন্তু ঘটিখানা বাটিখানা নয়। লুচিখানা, কচুরিখানা; কিন্তু সন্দেশখানা মেঠাইখানা নয়। শালপাতাখানা, কলাপাতাখানা; কিন্তু আমখানা কাঁঠালখানা নয়।

এই যে নিয়মের উল্লেখ করা গেল ইহা সর্বত্র খাটে না। যে জিনিস পাতলা নহে তাহার সম্বন্ধেও ‘খানা’ ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন খাটখানা, চৌকিখানা, ঘরখানা, নৌকাখানা। ইহাও দেখা গিয়াছে, এই ‘খানা’ চিহ্নের ব্যবহার সম্বন্ধে সকলের অভ্যাস সমান নহে।

তবে ‘খানা’র প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটা সাধারণ নিয়ম বলা যায়। জীব সম্বন্ধে কোথাও ইহার ব্যবহার নাই; গোরুখানা ভেড়াখানা হয় না। দেহ ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহারে বাধা নাই। দেহখানা, হাতখানা, পাখানা। বুকখানা সাত হাত হয়ে উঠল; মায়ের কোলখানি ভরে আছে; মাংসখানা ঝুলে পড়েছে; ঠোঁটখানি রাঙা; ভুরুখানা বাঁকা।

অরূপ পদার্থ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার নাই। বাতাসখানা বলা চলে না; আলোখানাও সেইরূপ; কারণ, তাহার অবয়ব নাই। যত্নখানা, আদরখানা, ভয়খানা, রাগখানা হয় না। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে; যথা, ভাবখানা, স্বভাবখানা, ধরনখানা, চলনখানি।

যে-সকল বস্তু অবয়ব গ্রহণ না করিয়া তরল বা বিচ্ছিন্নভাবে থাকে তাহাদের

সম্বন্ধে ‘খানা’ বসে না। যেমন, বালিখানা, ধুলোখানা, মাটিখানা, দুধখানা, জলখানা, তেলখানা হয় না।

ধুলা কাদা তেল জল প্রভৃতি শব্দের সহিত ‘এক’ শব্দটিকে বিশেষণরূপে যোগ করা যায় না। যেমন, একটা ধুলা বা একটা জল বলি না। কিন্তু ‘অনেক’ শব্দটির সহিত এরূপ কোনো বাধা নেই। যেমন, অনেকটা জল বা অনেকখানি জল বলা চলে। বলা বাহুল্য এখানে ‘অনেক’ শব্দ দ্বারা সংখ্যা বুঝাইতেছে না –পরিমাণ বুঝাইতেছে।

এখানে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এরূপ স্থলে আমরা ‘খানি’ ব্যবহার করি; ‘খানা’ ব্যবহার করি না। ‘অনেকখানি দুধ’ বলি, ‘অনেকখানা দুধ’ বলি না। এ স্থলে দেখা যাইতেছে, পরিমাণ ও সংখ্যা সম্বন্ধে ‘খানি’ ব্যবহার হয়, ‘খানা’ কেবলমাত্র সংখ্যা সম্বন্ধেই খাটে।

বাংলায় হাসিখানি শব্দ প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহা আদরের ভাষা। আদর করিয়া হাসিকে যেন স্বতন্ত্র একটি বস্তুর মতো করিয়া দেখা যাইতেছে। মনে পড়িতেছে বৈষ্ণব সাহিত্যে এমন ভাবের কথা কোথায় দেখিয়াছি যে, ‘তাহার মুখের কথাখানির যদি লাগ পাইতাম’–এখানে আদর করিয়া মুখের কথাটিকে যেন মূর্তি দেওয়া হইতেছে। এইরূপ ভাবেই ‘স্পর্শখানি’ বলিয়া থাকি।

খানি ও খানা যেখানে বসে সেখানে ইচ্ছামত সর্বত্রই টি ও টা বসিতে পারে– কিন্তু টি ও টা-র স্থলে সর্বত্র খানি ও খানার অধিকার নাই।

গাছা ও গাছি

‘খানি খানা’ যেমন মোটের উপরে চওড়া জিনিসের পক্ষে, ‘গাছা’ তেমনি সরু জিনিসের পক্ষে। যেমন, ছড়িগাছা, লাঠিগাছা, দড়িগাছা, সুতোগাছা, হারগাছা,

মালাগাছা, চুড়িগাছা, মলগাছা, শিকলগাছা।

এই সংকেতের সঙ্গে যখন পুনশ্চ 'টি' ও 'টা' চিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে তখন 'গাছি' 'গাছা' শব্দের অন্তস্থিত ইকার আকার লুপ্ত হইয়া যায়। যথা, লাঠিগাছটা মালাগাছটা ইত্যাদি।

জীববাচক পদার্থ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার নাই। কেঁচোগাছি বলা চলে না।

সরু জিনিস লম্বায় ছোটো হইলে তাহার সম্বন্ধে ব্যবহার হয় না। দড়িগাছা, কিন্তু গোঁফগাছা নয়। শলাগাছটা, কিন্তু ছুঁচগাছটা নয়। চুলগাছি যখন বলা হয় তখন লম্বাচুলই বুঝায়।

যেখানে গাছি ও গাছা বসে সেখানে সর্বত্রই বিকল্পে টি ও টা বসিতে পারে– এবং কোনো কোনো স্থলে খানি ও খানা বসিতে পারে।

বাংলা বহুবচন

পূর্বে বলা হইয়াছে 'গোটা' শব্দের অর্থ সমগ্র। বাংলায় যেখানে বলে 'একটা', উড়িয়া ভাষায় সেখানে বলে গোটা। এবং এই গোটা শব্দের টা অংশই বাংলা বিশেষ বিশেষ্যে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ববঙ্গে ইহার প্রথম অংশটুকু ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে 'চৌকিটা', পূর্ববঙ্গে 'চৌকি গুয়া'।

ভাষায় অন্যত্র ইহার নজির আছে। একদা 'কর' শব্দ সম্বন্ধকারকের চিহ্ন ছিল

—যথা, তোমাকর, তাকর। এখন পশ্চিমভারতে ইহার ‘ক’ অংশ ও পূর্বভারতে ‘র’ অংশ সম্বন্ধ চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দি হম্‌কা, বাংলা আমার।

একবচনে যেমন গোটা, বহুবচনে তেমনি গুলা। (মানুষগোটা), মানুষটা একবচন, মানুষগুলা বহুবচন। উড়িয়া ভাষায় এইরূপ বহুবচনার্থে ‘গুড়িয়ে’ শব্দের ব্যবহার আছে।

এই ‘গোটা’রই বহুবচনরূপ গুলা, তাহার প্রমাণ এই যে, ‘টা’ সংযোগে যেমন বিশেষ্য শব্দ তাহার সামান্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তাহার বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে—গুলা ও গুলির দ্বারাও সেইরূপ ঘটে। যেমন, ‘টেবিলগুলা বাঁকা’—অর্থাৎ বিশেষ কয়েকটি টেবিল বাঁকা, সামান্যত টেবিল বাঁকা নহে। কাক সাদা বলা চলে না, কিন্তু কাকগুলো সাদা বলা চলে, কারণ, বিশেষ কয়েকটা কাক সাদা হওয়া অসম্ভব নহে।

এই ‘গুলা’ শব্দযোগে বহুবচনরূপ নিষ্পন্ন করাই বাংলার সাধারণ নিয়ম। বিশেষ স্থলে বিকল্পে শব্দের সহিত ‘রা’ ও ‘এরা’ যোগ হয়। যেমন, মানুষেরা, কেরানীরা ইত্যাদি।

এই ‘রা’ ও ‘এরা’ জীববাচক বিশেষ্যপদ ছাড়া অন্যত্র ব্যবহৃত হয় না।

হলন্ত শব্দের সঙ্গে ‘এরা’ এবং অন্য স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে ‘রা’ যুক্ত হয়। যেমন বালকেরা, বধূরা। বালকগুলি, বধূগুলি ইত্যাদিও হয়।

কথিতভাষায় এই ‘এরা’ চিহ্নের ‘এ’ প্রায়ই লুপ্ত হইয়া থাকে—আমরা বলি বালকরা, ছাত্ররা ইত্যাদি।

ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যপদেরও বহুবচনরূপ হইয়া থাকে। যথা, রামেরা—অর্থাৎ রাম ও আনুষঙ্গিক অন্য সকলে। এরূপ স্থলে কদাপি গুলা গুলির প্রয়োগ হয় না। কারণ রামগুলি বলিলে প্রত্যেকটিরই রাম হওয়া আবশ্যক হয়।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে এই ‘এরা’ সম্বন্ধকারকরূপ হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ রামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যাহারা তাহারাই ‘রামেরা’। যেমন তির্যকরূপে ‘জন’ শব্দকে জোর দিয়া হইয়াছে ‘জনা’, সেইরূপ ‘রামের’ শব্দকে জোর দিয়া হইয়াছে রামেরা।

‘সব’, ‘সকল’ ও ‘সমুদয়’ শব্দ বিশেষ্য শব্দের পূর্বে বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়া বহুত্ব অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু বস্তুত এই বিশেষণগুলি সমষ্টিবাচক। ‘সব লোক’ এবং ‘লোকগুলি’-র মধ্যে অর্থভেদ আছে। ‘সব লোক’ ইংরেজিতে all men এবং লোকগুলি the men।

লিখিত বাংলায়, ‘সকল’ ও ‘সমুদয়’ শব্দ বিশেষ্যপদের পরে বসে। কিন্তু কথিত বাংলায় কখনোই তা হয় না। সকল গোরু বলি, গোরু সকল বলি না। বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এইরূপ প্রয়োগ সম্ভবত আধুনিককালে গদ্যরচনা সৃষ্টির সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছে। লিখিত ভাষায় ‘সকল’ যখন কোনো শব্দের পরে বসে তখন তাহা তাহার মূল অর্থ ত্যাগ করিয়া শব্দটিকে বহুবচনের ভাব দান করে। লোকগুলি এবং লোকসকল একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রাচীন লিখিত ভাষায় ‘সব’ শব্দ বিশেষ্যপদের পরে যুক্ত হইত। এখন সে রীতি উঠিয়া গেছে, এখন কেবল পূর্বেই তাহার ব্যবহার আছে। কেবল বর্তমান কাব্যসাহিত্যে এখনো ইহার প্রয়োগ দেখা যায়—যথা, ‘পাখি সব করে রব’। বর্তমানে বিশেষ্যপদের পরে ‘সব’ শব্দ বসাইতে হইলে বিশেষ্য বহুবচন রূপ গ্রহণ করে। যথা, পাখিরা সব, ছেলেরা সব অথবা ছেলেরা সবাই। বলা বাহুল্য, জীববাচক শব্দ ব্যতীত অন্যত্র বহুবচনে এই ‘রা’ ও ‘এরা’ চিহ্ন বসে না। বানরগুলা সব, ঘোড়াগুলা সব, টেবিলগুলা সব, দোয়াতগুলা সব—এইরূপ গুলাযোগে, সচেতন অচেতন সকল পদার্থ সম্বন্ধেই ‘সব’ শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে।

‘অনেক’ বিশেষণ শব্দ যখন বিশেষ্যপদের পূর্বে বসে তখন স্বভাবতই তদ্দ্বারা বিশেষ্যের বহুত্ব বুঝায়। কিন্তু এই ‘অনেক’ বিশেষণের সংস্রবে বিশেষ্যপদ

পুনশ্চ বহুবচন রূপ গ্রহণ করে না। ইংরেজিতে many বিশেষণ সত্ত্বেও man শব্দ বহুবচন রূপ গ্রহণ করিয়া men হয়—সংস্কৃতে অনেকা লোকাঃ, কিন্তু বাংলায় অনেক লোকগুলি হয় না।

অথচ 'সকল' বিশেষণের যোগে বিশেষ্যপদ বিকল্পে বহুবচন রূপও গ্রহণ করে। আমরা বলিয়া থাকি, সকল সভ্যেরাই এসেছেন—সকল সভ্যই এসেছেন এরূপও বলা যায়। কিন্তু অনেক সভ্যেরা এসেছেন কোনোমতেই বলা চলে না। 'সব' শব্দও 'সকল' শব্দের ন্যায়। 'সব পালোয়ানরাই সমান' এবং 'সব' পালোয়ানই সমান' দুই চলে।

'বিস্তর' শব্দ 'অনেক' শব্দের ন্যায়। অর্থাৎ এই বিশেষণ পূর্বে থাকিলে বিশেষ্যপদ আর বহুবচন রূপ গ্রহণ করে না—'বিস্তর লোকেরা' বলা চলে না।

এইরূপ আর-একটি শব্দ আছে তাহা লিখিত বাংলায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না—কিন্তু কথিত বাংলায় তাহারই ব্যবহার অধিক, সেটি 'ঢের'। ইহার নিয়ম 'বিস্তর' ও 'অনেক' শব্দের ন্যায়ই। 'গুচ্ছার' শব্দও প্রাকৃত বাংলায় প্রচলিত। ইহা প্রায়ই বিরক্তি-প্রকাশক। যখন বলি গুচ্ছার লোক জমেছে তখন বুঝিতে হইবে সেই লোকসমাগম প্রীতিকর নহে। ইহা সম্ভবত গোটাচার শব্দ হইতে উদ্ভূত।

সংখ্যাবাচক বিশেষ্য পূর্বে যুক্ত হইলে বিশেষ্যপদ বহুবচন রূপ গ্রহণ করে না। যেমন, চার দিন, তিন জন, দুটো আম।

গণ, দল, সমূহ, বৃন্দ, বর্গ, কুল, চয়, মালা, শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি প্রভৃতি শব্দযোগে বিশেষ্যপদ বহুত্ব অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহা সংস্কৃত রীতি। এইজন্য অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ ছাড়া অন্যত্র ইহার ব্যবহার নাই। বস্তুত ইহাদিগকে বহুবচনের চিহ্ন বলাই চলে না। কারণ ইহাদের সম্বন্ধেও বহুবচনের প্রয়োগ হইতে পারে—যেমন সৈন্যগণেরা, পদাতিক দলেরা ইত্যাদি। ইহারা সমষ্টিবোধক।

ইহাদের মধ্যে ‘গণ’ শব্দ প্রাকৃত বাংলার অন্তর্গত হইয়াছে। এইজন্যে ‘পদাতিকগণ’ এবং ‘পাইকগণ’ দুই বলা চলে। কিন্তু ‘লাঠিয়ালবৃন্দ’ কলুকুল’ বা ‘আটচালাচয়’ বলা চলে না।

গণ, মালা, শ্রেণী ও পঙ্‌ক্তি শব্দ সর্বত্র ব্যবহৃত হইতে পারে না। গণ ও দল কেবল প্রাণীবাচক শব্দের সহিতই চলে। কখনো কখনো রূপকভাবে মেঘদল তরঙ্গদল বৃক্ষদল প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মালা, শ্রেণী ও পঙ্‌ক্তি শব্দের অর্থ অনুসারেই তাহার ব্যবহার, এ কথা বলা বাহুল্য।

প্রাকৃত বাংলায় এইরূপ অর্থবোধক শব্দ ঝাঁক, গোচ্ছা, আঁটি, গ্রাস। কিন্তু এগুলি সমাস-রূপে শব্দের সহিত সংযুক্ত হয় না। আমরা বলি পাখির ঝাঁক, চাবির গোচ্ছা, ধানের আঁটি, ভাতের গ্রাস, অথবা দুই ঝাঁক পাখি, এক গোচ্ছা চাবি, চার আঁটি ধান, দুই গ্রাস ভাত।

‘পত্র’ শব্দযোগে বাংলায় কতকগুলি শব্দ বহুত্ব অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু সেই বিশেষ কয়েকটি শব্দ ছাড়া অন্য শব্দের সহিত উহার ব্যবহার চলে না। গহনাপত্র, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, জিনিসপত্র, বিছানাপত্র, ঔষধপত্র, খরচপত্র, দেনাপত্র, চিঠিপত্র, খাতাপত্র, চোতাপত্র, হিসাবপত্র, নিকাশপত্র, দলিলপত্র, পুঁথিপত্র, বিষয়পত্র।

পরিমাণ-সম্বন্ধীয় বহুত্ব বোঝাইবার জন্য বাংলায় শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে; যেমন বস্তাবস্তা, ঝুড়িঝুড়ি, মুঠামুঠা, বাক্সবাক্স, কলসিকলসি, বাটিবাটি। এগুলি কেবলমাত্র আধারবাচক শব্দ সম্বন্ধেই খাটে; মাপ বা ওজন সম্বন্ধে খাটে না—গজ-গজ বা সের-সের বলা চলে না।

সময় সম্বন্ধেও বহুত্ব অর্থে শব্দদ্বৈত ঘটে—বার বার, দিন দিন, মাস মাস, ঘড়ি ঘড়ি। বহুত্ব বুঝাইবার জন্য সমার্থক দুই শব্দের যুগমতেতা ব্যবহৃত হয়, যেমন; লোকজন, কাজকর্ম, ছেলেপুলে, পাখিপাখালী জন্তুজানোয়ার, কাঙালগরিব, রাজারাজড়া, বাজনাবাদ্য। এই-সকল যুগম শব্দের দুই অংশের

এক অর্থ নহে কাছাকাছি অর্থ এমন দৃষ্টান্তও আছে; দোকানহাট, শাকসবজি, বনজঙ্গল, মুটেমজুর, হাঁড়িকুঁড়ি। এরূপ স্থলে বহুত্বের সঙ্গে কতকটা বৈচিত্র্য বুঝায়। যুগমদো শব্দের একাংশের কোনো অর্থ নাই এমনও আছে। যেমন, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন, চাকরবাকর। এ স্থলেও কতকটা বৈচিত্র্য অর্থ দেখা যায়।

কথিত বাংলায় ‘ট’ অক্ষরের সাহায্যে একপ্রকার বিকৃত শব্দদ্বৈত আছে। যেমন, জিনিসটিনিস, ঘোড়াটোড়া। ইহাতে প্রভৃতি শব্দের ভাবটা বুঝায়।

স্ত্রীলিঙ্গ

ভারতবর্ষের অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষায় শব্দগুলি অনেক স্থলে বিনা কারণেই স্ত্রী ও পুরুষ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। হিন্দিতে ভোঁ (ভ্রূ), মৃত্যু, আগ (অগ্নি), ধূপ শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। সোনা, রুপা, হীরা, প্রেম, লোভ পুংলিঙ্গ। বাংলা শব্দে এরূপ অকারণ, কাল্পনিক, বা উচ্চারণমূলক স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। এমন-কি, অনেক সময় স্বাভাবিক স্ত্রীবাচক শব্দও স্ত্রীলিঙ্গসূচক কোনো প্রত্যয় গ্রহণ করে না। সেরূপ স্থলে বিশেষভাবে স্ত্রীজাতীয়ত্ব বুঝাইতে হইলে বিশেষণের প্রয়োজন হয়। কুকুর, বিড়াল, উট, মহিষ প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দের নিয়মে ব্যবহারকালে লিখিত ভাষায় কুক্কুরী, বিড়ালী, উষ্ট্রী, মহিষী হইয়া থাকে কিন্তু কথিত ভাষায় এরূপ ব্যবহার হাস্যকর।

সাধারণত ই এবং ঈ প্রত্যয় ও নি এবং নী প্রত্যয় যোগে বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয়। ই ও ঈ প্রত্যয় : ছোঁড়া ছুঁড়ি, ছোকরা ছুকরি, খুড়া খুড়ি, কাকা কাকি, মামা মামি, পাগলা পাগলি, জেঠা জেঠি জেঠাই, বেটা বেটি, দাদা দিদি, মেসো মাসি, পিসে পিসি, পাঁঠা পাঁঠি, ভেড়া ভেড়ি, ঘোড়া ঘুড়ি, বুড়া

বুড়ি, বামন বাম্‌নি, খোকা খুকি, শ্যালা শ্যালি, অভাগা অভাগী, হতভাগা হতভাগী, বোষ্টম বোষ্টমী, নেড়া নেড়ি।

নি ও নী প্রত্যয় : কলু কলুনি, তেলি তেলিনি, গয়লা গয়লানি, বাঘ বাঘিনি, মালি মালিনী, ধোবা ধোবানি, নাপিত নাপ্‌তানি (নাপ্‌তিনি), কামার কামারনি, চামার চামারনি, পুরুত পুরুতনি, মেথর মেথরানি, তাঁতি তাঁতিনি, মজুর মজুরনি, ঠাকুর ঠাকুরানি (ঠাক্‌রুন), চাকর চাকরানি, হাড়ি হাড়িনি, সাপ সাপিনি, পাগল পাগলিনি, উড়ে উড়েনি, কয়েত কায়েতনি, খোট্টা খোট্টানি, চৌধুরী চৌধুরানী, মোগল মোগলানি, মুসলমান মুসলমাননি, জেলে জেলেনি, রাজপুত রাজপুতনি, বেয়াই বেয়ান।

এই প্রত্যয়যোগের নিয়ম কী তাহা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ এ প্রত্যয়টি কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দেই আবদ্ধ, তাহার বাহিরে প্রয়োজন হইলেও ব্যবহার হয় না। পাঞ্জাবি সম্বন্ধে পাঞ্জাবিনি, মারাঠা সম্বন্ধে মারাঠনি, গুজরাটি সম্বন্ধে গুজরাট্‌নি প্রয়োগ নাই। উড়েনি আছে কিন্তু শিখ্‌নি মগ্‌নি মাদ্রাজিনী নাই।

ময়ূর জাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে দৃশ্যত বিশেষ পার্থক্য থাকাতে ভাষায় ময়ূর ময়ূরী ব্যবহৃত হয় কিন্তু চিল সম্বন্ধে এরূপ ব্যবহার নাই।

পুরুষ মেয়ে, অথবা পুরুষ মানুষ, মেয়ে মানুষ, স্বামী স্ত্রী, ভাই বোন, বাপ মা, ছেলে মেয়ে, মদ্দা মাদী, ষাঁড় গাই, বর কনে, জামাই বউ, (বউ শব্দটি পুত্রবধূ ও স্ত্রী উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়)। সাহেব বিবি বা মেম, কর্তা গিন্নি (গৃহিণী), ভূত পেত্নী প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ আছে যাহার স্ত্রীলিঙ্গবাচক ও পুংলিঙ্গবাচক রূপ স্বতন্ত্র।

সংস্কৃত ভাষার মতো বাংলা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। বাংলায় লিখিত বা কথিত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারকালে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে কখনো কখনো স্ত্রীলিঙ্গ রূপ ব্যবহার হয়–কিন্তু ক্রমশ ভাষা যতই

সহজ হইতেছে ততই ইহা কমিয়া আসিতেছে। বিষমা বিপদ, পরমা সম্পদ, বা মধুরা ভাষা পরম পণ্ডিতেও বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেন না। বিশেষত বিশেষণ যখন বিশেষ্যের পরে ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয় তখন তাহা বর্তমান বাংলায় কখনোই স্ত্রীলিঙ্গ হয় না—অতিক্রান্তা রজনী বলা যাইতে পারে কিন্তু রজনী অতিক্রান্তা হইল, আজকালকার দিনে কেহই লিখে না।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উচ্চারণমতে কতগুলি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার-কালে আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানি কিন্তু আধুনিক ভাষায় দেশ সম্বন্ধে তাহা খাটে না। ভারতবর্ষ বা ভারত, সংস্কৃত ভাষায় কখনোই স্ত্রী শ্রেণীয় শব্দ হইতে পারে না, কিন্তু আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে তাহাকে ভারতমাতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। বঙ্গও সেইরূপ বঙ্গমাতা। দেশকে মাতৃভাবে চিন্তা করাই প্রচলিত হওয়াতে দেশের নামকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে মানা হয় না।

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয় গ্রহণকালে সংস্কৃত নিয়ম রক্ষা করে না। যেমন, সিংহিনী (সিংহী), গৃধিনী (গৃধ্রী, গৃধ্র শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না), অধীনী (অধীনা), হংসিনী (হংসী), সুকেশিনী (সুকেশী), মাতঙ্গিনী (মাতঙ্গী), কুরঙ্গিনী (কুরঙ্গী), বিহঙ্গিনী (বিহঙ্গী), ভুজঙ্গিনী (ভুজঙ্গী), হেমাঙ্গিনী (হেমাঙ্গী)।

বিশেষণ শব্দ বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয় প্রাপ্ত হয় না কিন্তু বিশেষণপদ বিশেষ্য অর্থ গ্রহণ করিলে এ নিয়ম সর্বত্র খাটে না। খেঁদী, নেকী।

ইয়া প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ইয়া প্রত্যয় ত্যাগ করিয়া ই প্রত্যয় গ্রহণ করে। ঘর-ভাঙানিয়া (ভাঙানে) ঘরভাঙানী, মনমাতানিয়া মনমাতানী, পাড়াকুঁদুলিয়া পাড়াকুঁদুলি, কীর্তনীয়া কীর্তনী।

হিন্দিতে ক্ষুদ্রতা ও সৌকুমার্য-বোধক ই প্রত্যয়যুক্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়—পুং গাড়া, স্ত্রীং গাড়ি, পুং রস্‌সা, স্ত্রীং রস্‌সী।

বাংলায় বৃহত্ত্ব অর্থে আ ও ক্ষুদ্রত্ব অর্থে ই প্রত্যয় প্রয়োগ হইয়া থাকে, অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার দৃষ্টান্ত অনুসারে ইহাদিগকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

রসা রসি, দড়া দড়ি, ঘড়া ঘটি, বড়া বড়ি, ঝোলা ঝুলি, নোড়া নুড়ি, গোলা গুলি,হাঁড়া হাঁড়ি, ছোরা ছুরি, ঘুষা ঘুষি, কুপা কুপি, কড়া কড়ি, ঝোড়া ঝুড়ি, কলস কল্‌সি, জোড়া জুড়ি, ছাতা ছাতি।

কোনো কোনো স্থলে এইপ্রকার রূপান্তরে কেবল ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ত্ব ভেদ বুঝায় না একেবারে দ্রব্যভেদ বুঝায়। যথা, কোঁড়া (বাঁশের) কুঁড়ি (ফুলের), জাঁতা জাঁতি, বাটা (পানের) বাটি।

কিন্তু এ কথা বলা আবশ্যক টা ও টি, গুলা ও গুলি স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ উভয় প্রকার শব্দেই ব্যবহৃত হয়। মেয়েগুলো, ছেলেগুলা, বউটা, জামাইটি ইত্যাদি।

প্রতিশব্দ

১

ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার একটা কারবার চলিয়াছে। সেই কারবার-সূত্রে বিশ্বের হাটে আমাদের ভাবের লেনা-দেনা ঘটিতেছে। এই লেনা-দেনায় সব চেয়ে বিঘ্ন ভাষায় শব্দের অভাব। একদিন আমাদের দেশের ইংরেজি পড়ুয়ারা এই দৈন্য দেখিয়া নিজের ভাষার প্রতি উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা ইংরাজিতেই লেখাপড়া শুরু করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাংলাদেশের বড়ো সৌভাগ্য এই যে, সেই বড়ো দৈন্যের অবস্থাতেও

দেশে এমন সকল মানুষ উঠিয়াছিলেন যাঁহারা বুঝিয়াছিলেন বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া ছাড়া দেশের মনকে বলবান করিবার কোনো উপায় নাই। তাঁহার ভরসা করিয়া তখনকার দিনের বাংলা ভাষার গ্রাম্য হাটেই বিশ্বসম্পদের কারবার খুলিয়া বসিলেন। সেই কারবারের মূলধন তখন সামান্য ছিল কিন্তু আশা ছিল মস্ত। সেই আশা দিনে দিনেই সার্থক হইয়া উঠিতেছে। আজ মূলধন বাড়িয়া উঠিয়াছে–আজ শুধু কেবল আমাদের আমদানির হাট নয়–রফ্‌তানিও শুরু হইল।

ইহার ফল হইয়াছে এই যে বাংলা দেশ, ধনের বাণিজ্যে যথেষ্ট পিছাইয়া আছে বটে কিন্তু ভাবের বাণিজ্যে বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে ছাড়াইয়া গেল। মাদ্রাজে যখন গিয়াছিলাম তখন একটা প্রশ্ন বার বার অনেকের কাছেই শুনিয়াছি–"মৌলিন্যে বাংলাদেশ আমাদের চেয়ে এত অগ্রসর হইল কেন?" তাহার সব কারণ স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা সহজ নহে। কিন্তু অন্তত একটা কারণ এই যে, বাঙালির ছেলেমেয়ে শিশুকাল হইতেই বাংলা সাহিত্য হইতে তাহাদের মনের খোরাক পাইয়া আসিতেছে। অধিক বয়সে যে পর্যন্ত না ইংরেজি শেখে সে পর্যন্ত তাহার মন উপবাসী থাকে না।

আজ পর্যন্ত আমাদের ভাষা প্রধানত ধর্মসাহিত্য এবং রসসাহিত্য লইয়াই চলিয়া আসিতেছে। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায় যে-সকল শব্দের দরকার তাহা আমাদের ভাষায় জমে নাই। এইজন্য আমাদের ভাষায় শিক্ষার উচ্চ অঙ্গ কানা হইয়া আছে।

কিন্তু কেবল পরিভাষা নহে, সকলপ্রকার আলোচনাতেই আমরা এমন অনেক কথা পাই যাহা ইংরেজি ভাষায় সুপ্রচলিত, অথচ যাহার ঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় নাই। ইহা লইয়া আমাদের পদে পদেই বাধে। আজিকার দিনে সে-সকল কথার প্রয়োজন উপেক্ষা করিবার জো নাই। এইজন্য শান্তিনিকেতন পত্রে আমরা মাঝে মাঝে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা প্রতিশব্দ বানাইবার চেষ্টা করিব–তাহা যে সাহিত্যে চলিবে এমন দাবি করিব না, কেবল তাহার যাচাই করিতে ইচ্ছা করি। আমি চাই আমাদের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা এ সময়ে

কিছু ভাবিবেন। কোনো শব্দ যদি পছন্দ না হয়, বা আর-একটা শব্দ যদি তাঁহাদের মাথায় আসে, তবে এই পত্রে তাহা জানাইবেন।

ইংরেজি Nation কথাটার আমরা প্রতিশব্দরূপে ‘জাতি’ কথাটা ব্যবহার করি। নেশান শব্দের মূল ধাতুগত অর্থ জাতি শব্দের সঙ্গে মেলে। যাহাদের মধ্যে জন্মগত বন্ধনের ঐক্য আছে তাহারাই নেশন। তাহাদিগকেই আমরা জাতি বলিতে পারিতাম কিন্তু আমাদের ভাষায় জাতি শব্দ একদিকে অধিকতর ব্যাপক, অন্য দিকে অধিকতর সংকীর্ণ। আমরা বলি পুরুষজাতি, স্ত্রীজাতি, মনুষ্যজাতি, পশুজাতি ইত্যাদি। আবার ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদও জাতিভেদ। এমন স্থলে নেশনের প্রতিশব্দরূপে জাতি শব্দ ব্যবহার করিলে সেটা ঠিক হয় না। আমি নেশন শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার না করিয়া ইংরেজি শব্দটাই চালাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

ইংরেজি Nation, race, tribe, caste, genus, species—এই ছয়টা শব্দকেই আমরা জাতি শব্দ দিয়া তর্জমা করি। তাহাতে ভাষার শৈথিল্য ঘটে। আমি প্রতিশব্দের একটা খসড়া নিম্নে লিখিলাম—এ সম্বন্ধে বিচার প্রার্থনা করি।

Nation—অধিজাতি। National—আধিজাতিক। Nationalism—আধিজাত্য।
Race—প্রবংশ। Race preservation—প্রবংশ রক্ষা।
Tribe—জাতি সম্প্রদায়। Caste—জাতি, বর্ণ। Genus এবং species কে যথাক্রমে মহাজাতি ও উপজাতি নাম দেওয়া যাইতে পারে।

২

প্রতিশব্দ সম্বন্ধে আষাঢ়ের শান্তিনিকেতনে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল সে সম্বন্ধে পাঠকদের কাছ হইতে আলোচনা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু এখনো কাহারো কাছ হইতে কোনো সাড়া মেলে নাই। কিন্তু এ-সব কাজ একতরফা হইলে কাঁচা থাকিয়া যায়। যে-সকল শব্দকে ভাষায় তুলিয়া লইতে হইবে তাহাদের সম্বন্ধে বিচার ও সম্মতির প্রয়োজন।

আমি নিজেই বলিয়াছি নেশন কথাটাকে তর্জমা না করিয়া ব্যবহার করাই ভালো। ওটা নিতান্তই ইংরেজি, অর্থাৎ ঐ শব্দের দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ করা হয়, সে অর্থ ইহার আগে আমরা ব্যবহার করি নাই। এমন-কি, ইংরেজিতেও নেশনের সংজ্ঞা নির্ণয় করা শক্ত।

সেইজন্যই বাংলায় প্রচলিত কোনো শব্দ নেশনের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিলে কিছুতেই খাপ খাইবে না। “জাতি” কথাটা ঐ অর্থে আজকাল আমরা ব্যবহার করি বটে কিন্তু তাহাতে ভাষার ঢিলামিকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। বরঞ্চ সাহিত্য ইতিহাস সংগীত বিদ্যালয় প্রভৃতি শব্দ-সহযোগে যখন আমরা ‘জাতীয়’ বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া থাকি তখন তাহাতে কাজ চলিয়া যায়— কারণ ঐ বিশেষণের অন্য কোনো কাজ নাই। সেইজন্যই ‘জাতীয়’ বিশেষণ শব্দটি ন্যাশনল শব্দের প্রতিশব্দরূপে এমনি শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে যে, উহাকে আর উৎপাটিত করিবার জো নাই। কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে যদি nation, race, tribe, clan শব্দের বিশেষত্ব নির্দেশ করার প্রয়োজন ঘটে তবে বিপদে পড়িতে হইবে। সুতরাং নেশন ও ন্যাশনাল কথাটা বাংলায় জাতে তুলিয়া লওয়া কর্তব্য মনে করি। এমন বিস্তর বিদেশী কথা বাংলায় চলিয়া গেছে।

এই ‘জাতি’ শব্দের প্রসঙ্গে আর-একটি শব্দ মনে পড়িতেছে যাহার একটা কিনারা করা আশু আবশ্যক। কোনো বিশেষকালে-জাত সমস্ত প্রজাকে ইংরেজিতে generation বলে। বর্তমান অতীত বা ভাবী জেনেরেশন সম্বন্ধে যখন বাংলায় আলোচনার দরকার হয় তখন আমরা পাশ কাটাইয়া যাই। কিন্তু বিঘ্ন দূর না করিয়া বিঘ্ন এড়াইয়া চলিলে ভাষার দুর্বলতা ঘোচে না।

বস্তুত বাংলায় ‘প্রজা’ কথার অন্য অর্থ যদি চলিত না থাকিত তবে ঐ কথাটি ঠিক কাজে লাগিত। বর্তমানে যাহারা জাত তাহাদিগকে বর্তমানকালের প্রজা, অতীতকালে যাহারা জাত তাহাদিগকে অতীত কালের প্রজা বলিলে কোনো গোল হইত না। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। ‘জন’ কথাটারও ঐ রকমেরই অর্থ। জন্ম শব্দের সঙ্গেই উহার যোগ। কিন্তু উহার প্রচলিত অর্থটি প্রবল, অন্য

কোনো অর্থে উহাকে খাটানো চলিবে না।

অতএব প্রজা এবং জন এই কথার মাঝামাঝি একটা কথা যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে সেটা ব্যবহারে লাগানো যায়। যথা, প্রজন। মনুতে স্ত্রীলোকের বর্ণনাস্থলে আছে ‘প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।’ অর্থাৎ প্রজনের জন্য স্ত্রীজাতি পূজনীয়া। ইংরেজি ভাষায় generation শব্দের অন্য যে-অর্থ আছে অর্থাৎ জন্মদান করা, এই প্রজনের সেই অর্থ। কিন্তু পূর্বকথিত অর্থে এই শব্দকে ব্যবহার করিলে কানে খারাপ লাগিবে না। প্রজন শব্দটা প্রথমে বুঝিতে হয়তো গোল ঠেকিবে, উহার বদলে যদি ‘প্রজাত’ শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত সহজে বুঝা যাইবে। এ সম্বন্ধে পাঠকদের মত জানিতে চাই।

আমার ‘প্রতিশব্দ’ প্রবন্ধ উপলক্ষে একটিমাত্র বিতর্ক উঠিয়াছে। সেটা ‘মৌলীন্য’ কথা লইয়া। Originality শব্দের যে প্রতিশব্দ আজকাল চলিতেছে সেটা ‘মৌলিকতা’। সেটা কিছুতেই আমার ভালো লাগে নাই। কারণ ‘মৌলিক’ বলিলে সাধারণত বুঝায় মূলসম্বন্ধীয়—ইংরেজিতে radical বলিতে যাহা বুঝায়। যথা, radical change—মৌলিক পরিবর্তন। আপনাতেই যাহার মূল, তাহাকে মৌলিক বলিলে কেমন বেখাপ শোনায়। বরং নিজমূলক বলিলে চলে। কখনো কখনো আমি ‘স্বকীয়তা’ শব্দ Originality অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু সর্বত্র ইহা খাটে না। বিশেষ কাব্যকে স্বকীয় কাব্য বলা চলে না। মৌলিক কাব্য বলিলেও যে সুশ্রাব্য হয় তাহা নহে, তবু চোখ কান বুজিয়া সেটাকে কণ্ঠস্থ করা যায়।

এইজন্যই কুলীন শব্দে যেমন কুলগৌরব প্রকাশ করে তেমনি মূলীন শব্দে মূলগৌরব প্রকাশ করিবে এই মনে করিয়াই ঐ কথাটাকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। কিন্তু শাস্ত্রী-মহাশয় বলিয়াছেন কুলীন শব্দ ব্যাকরণের যেবিশেষ নিয়মে উৎপন্ন মূলীন শব্দে সে নিয়ম খাটে না। শুনিয়া ভয় পাইয়াছি। ভুল পুরাতন হইয়া গেলে বৈধ হইয়া উঠে, নূতন ভুলের কৌলীন্য নাই বলিয়াই ভাষায় তাহা পঙ্‌ক্তি পায় না। বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের ব্যভিচার অনেক

চলিয়াছে; কিন্তু আজকালকার দিনে পূর্বের চেয়ে পাহারা কড়াক্কড় হওয়ায় সে সম্ভাবনা আর নাই। অতএব জাতমাত্রই মৌলীন্য শব্দের অন্ত্যেষ্টি সৎকার করা গেল।

৩

বাংলায় ‘অপূর্ব’ শব্দ বিশেষ অর্থে প্রচলিত হইয়াছে। ‘অপূর্ব সৌন্দর্য’ বলিতে আমরা original beauty বুঝি না। যদি বলা যায় কবিতাটি অপূর্ব তাহা হইলে আমরা বুঝি তাহার বিশেষ একটি রমণীয়তা আছে,কিন্তু তাহা যে original এরূপ বুঝি না। ইংরেজিতে যাঁহাকে original man বলা যায় তিনি চিন্তায় কর্মে বা আচরণে অন্য কাহারো অনুসরণ করেন না। বাংলায় যদি তাঁহাকে বলি ‘লোকটি অপূর্ব’ তাহা হইলে সেটা ঠাট্টার মতো শোনায়। বোধ হয় এরূপ প্রসঙ্গে স্বানুবর্তী ও স্বানুবর্তিতা কথাটা চলিতে পারে। কিন্তু রচনা বা কর্ম সম্বন্ধে ও কথাটা খাটিবে না। ‘আদিম’ শব্দটি বাংলায় যদি ‘primitive’ অর্থে না ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে ওই শব্দটির প্রয়োগ এরূপ স্থলে সংগত হইত। বিশেষ কবিতাটি আদিম বা তাহার মধ্যে আদিমতা আছে বলিলে ঠিক ভাবটি বোঝায়। বস্তুত, অপূর্ব= strange, আদিম= original। অপূর্ব সৌন্দর্য= strange beauty, আদিম সৌন্দর্য= original beauty, আদি গঙ্গা= the original Ganges। আদি বুদ্ধ= the original Buddha আদি জ্যোতি= the original light। অপূর্ব জ্যোতি বলিলে বুঝাইবে, the strange light। আদি পুরুষ= the original ancestor, এরূপ স্থলে অপূর্ব পুরুষ বলাই চলে না।

৪

ইংরেজি পরিভাষিক শব্দের বাংলা করিবার চেষ্টা মাঝে মাঝে হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজিতে অনেক নিত্যপ্রচলিত সামান্য শব্দ আছে বাংলায় তাহার তর্জমা করিতে গেলে বাধিয়া যায়। ইংরেজি ক্লাসে বাংলায় ইংরেজি ব্যাখ্যা করিবার সময় পদে পদে ইহা অনুভব করি। ইহার একটা কারণ, তর্জমা করিবার সময় আমরা স্বভাবতই সাধু ভাষার সন্ধান করিয়া থাকি, চলিত ভাষায় যে-সকল কথা অত্যন্ত পরিচিত সেইগুলিই হঠাৎ আমাদের মনে আসে না। চলিত ভাষা লেখাপড়ার গণ্ডির মধ্যে একেবারেই চলিতে পারে না এই সংস্কারটি থাকাতেই

আমাদের মনে এইরূপ বাধা ঘটিয়াছে। ‘আমার’পরে তাহার sympathy নাই’ ইহার সহজ বাংলা ‘আমার’পরে তাহার sympathy নাই’, কিন্তু চলিত বাংলাকে অপাঙ্‌ক্তেয় ঠিক করিয়াছি বলিয়া ক্লাসে বা সাহিত্যে উহার গতিবিধি বন্ধ। এইজন্য ‘সহানুভূতি’ বলিয়া একটা বিকট শব্দ জোর করিয়া বানাইতে হইয়াছে; এই গুরুভার শব্দটা ভীমের গদার মতো, ইহাকে লইয়া সর্বদা সাধারণ কাজে ব্যবহার করিতে গেলে বড়োই অসংগত হয়।

দরদ কথাটা ঘর-গড়া নয়, ইহা সজীব, এইজন্য ইহার ব্যবহারের বৈচিত্র্য আছে। ‘লোকটা দরদী’ বলিলেই কথাটার ভাব বুঝিতে বিলম্ব হয় না—কিন্তু ‘লোকটা সহানুভব’ বলিলে কী যে বলা হইল বোঝাই যায় না, যদিচ মহানুভব কথাটা চলিত আছে। আমরা বলি, ‘ওস্তাদজি দরদ দিয়া গান করেন’, ইংরেজিতে এ স্থলে sympathy শব্দের ব্যবহার আছে কিন্তু ‘সহানুভূতি দিয়া গান করেন’ বলিলে মনে হয় যেন ওস্তাদজি গানের প্রতি বিষম একটা অত্যাচার করেন।

আসল কথা, অনুভূতি শব্দটা বাংলায় নূতন আমদানি, এইজন্য উহার’পরে আমাদের দরদ জন্মে নাই। এইজন্যই ‘সহানুভূতি’ শব্দটা শুনিলে আমাদের হৃদয় তখনি সাড়া দেয় না। এই কথাটা কাব্যে, এমন-কি, মেঘনাদবধের সমান ওজন কোনো মহাকাব্যেও, ব্যবহার করিতে পারেন এমন দুঃসাহসিক কেহ নাই। অনুভূতি কথাটা যেমন নূতন, বেদনা কথাটা তেমনি পুরাতন। এইজন্য সমবেদনা কথাটা কানে বাজে না। যেখানে দরদ শব্দটা খাপ খায় না সেখানে আমি ‘সমবেদনা’ শব্দ ব্যবহার করি, পারৎপক্ষে ‘সহানুভূতি’ ব্যবহার করি না।

তর্জমা করিবার সময় একটা জিনিস আমরা প্রায় ভুলিয়া যাই। প্রত্যেক ভাষায় এমন কোনো কোনো শব্দ থাকে যাহার নানা অর্থ আছে। আমাদের ‘ভাব’ কথাটা, কোথাও বা idea,কোথাও বা thought, কোথাও বা feeling, কোথাও বা suggestion, কোথাও বা gist। ভাব কথাটাকে ইংরেজিতে তর্জমা করিবার সময়ে সকল জায়গাতেই যদি idea শব্দ প্রয়োগ করি তবে তাহা অদ্ভুত হইবে। ‘এই প্রস্তাবের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে’ এরূপ বাক্য প্রয়োগ আমরা

মাঝে মাঝে শুনিয়াছি। ইহা ইংরেজি ভাষা-ব্যবহারের নকল, কিন্তু বাংলায় ইহা অত্যন্ত অসংগত। এ স্থলে ‘এই প্রস্তাবে আমাদের সম্মতি আছে’ বলা যায়– কারণ, প্রস্তাবের অনুভূতি নাই, সুতরাং তাহার সহিত সহানুভূতি চলে না। অতএব একভাষায় যেখানে একশব্দের দ্বারা নানা অর্থ বোঝায় অন্য ভাষায় তাহার এক প্রতিশব্দ হইতেই পারে না।

গতবারের শান্তিনিকেতনে originally শব্দের আলোচনাস্থলে আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। কোনো একজন মানুষের originally আছে এই ভাব ব্যক্ত করিবার সময়ে তাঁহার স্বানুবর্তিতা আছে বলা চলে না,সে স্থলে ‘আদিমতা’ আছে বলিলে ঠিক হয়; যে কবিতা হইতে আর-একটি কবিতা তর্জমা করা হইয়াছে সেই কবিতাকে মূল কবিতা বলিতে হইবে। যে কবিতায় বিশেষ অসামান্যতা আছে, তাহাকে অনন্যতন্ত্র কবিতা বলা চলে। ইহার উপযুক্ত সংস্কৃত কথাটি ‘স্বতন্ত্র’–কিন্তু বাংলায় অন্য অর্থে তাহার ব্যবহার। বস্তুত আমার মনে হয়, কি মানুষ সম্বন্ধে, কি মানুষের রচনা সম্বন্ধে, উভয় স্থলেই অনন্যতন্ত্র শব্দের ব্যবহার চলিতে পারে।

একটি অত্যন্ত সহজ কথা লইয়া বাংলা ভাষায় আমাদিগকে প্রায় দুঃখ পাইতে হয়–সে কথাটি feeling। Feeling-এর একটা অর্থ বোধশক্তি–ইহাকে আমরা ‘অনুভূতি’ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিতেছি। আর-একটি অর্থ হৃদয়বৃত্তি। কিন্তু হৃদয়বৃত্তি শব্দটা পারিভাষিক। সর্বদা ব্যবহারে ইহা চলিতে পারে না। অনেক সময়ে কেবলমাত্র ‘হৃদয়’ শব্দের দ্বারা কাজ চালানো যায়; যেখানে ইংরেজিতে বলে ‘feeling উত্তেজিত হইয়াছে’ সেখানে বাংলায় বলা চলে, ‘হৃদয়’ উত্তেজিত হইয়াছে। যে মানুষের feeling আছে তাহাকে সহৃদয় বলি। ‘কবি এই কবিতায় যে feeling প্রকাশ করিয়াছে’ এরূপ স্থলে feeling-এর প্রতিশব্দ স্বরূপে হৃদয়ভাব বলা যায়। শুধু ‘ভাব’ও অনেক সময়ে feeling-এর প্রতিশব্দরূপে চলে। Emotion শব্দটি বাংলায় তর্জমা করিবার সময় আমি বরাবর ‘আবেগ’ ও হৃদয়াবেগ’ শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে, সংস্কৃত ভাষায় পারিভাষিক ও সহজ অর্থে ‘feeling’ শব্দের কোন্ কোন্ প্রতিশব্দ ব্যবহৃত

হয়?

ইংরেজি culture শব্দের বাংলা লইয়া অনেক সময় ঠেকিতে হয়। ‘learning’ এবং ‘culture’ শব্দের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা সংস্কৃত কোন্ শব্দের দ্বারা বোঝায় আমি ঠিক জানি না। ‘বৈদগ্ধ্য’ শব্দের অর্থ ঠিক culture বলিয়া আমার বোধ হয় না। Culture শব্দে যে ভাব প্রকাশ হয় তাহা বাংলায় ব্যবহার না করিলে একেবারেই চলিবে না। একটি বিশেষ স্থলে আমি প্রথমে ‘চিত্তোৎকর্ষ’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম; কারণ culture শব্দের মতোই ‘উৎকর্ষ’ শব্দের মধ্যে কর্ষণের ভাব আছে। পরে আমি ‘চিত্তোৎকর্ষের’ পরিবর্তে ‘সমুৎকর্ষ’ শব্দটি গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, শুধু ‘উৎকর্ষ’ শব্দ এই বিশেষ অর্থে চালানো যায় কি না। Cultured mind-এর বাংলা করা যাইতে পারে ‘প্রাপ্তোৎকর্ষ-চিত্ত’। ভালো শোনায় যে তাহা নহে। ‘উৎকর্ষিত’ চিত্ত বলা যাইতে পারে; মানুষ সম্বন্ধে ব্যবহারের বেলায় ‘উৎকর্ষ-বান’ লোক বলিলে ক্ষতি হয় না। উৎকৃষ্ট বিশেষণ শব্দটি হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। যেমন ‘learning’ এবং ‘culture’ তেমনি ‘knowledge’ এবং ‘wisdom’-এর প্রভেদ আছে। কোন্ কোন্ শব্দের দ্বারা সেই প্রভেদ নির্ণীত হইবে তাহার উত্তরের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

কিছুদিন হইল আর-একটি ইংরেজি কথা লইয়া আমাকে ভাবিতে হইয়াছিল। সেটি ‘degeneracy’ আমি তাহার বাংলা করিয়াছিলাম আপজাত্য। যাহার আপজাত্য ঘটিয়াছে সে অপজাত (degenerate)। প্রথমে জননাপকর্ষ কথাটা মনে আসিয়াছিল, কিন্তু সুবিধামত তাহাকে বিশেষণ করা যায় না বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইল। বিশেষত অপ উপসর্গই যখন অপকর্ষবাচক তখন কথাটাকে বড়ো করিয়া তোলা অনাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি genetics নামে যে নূতন বিজ্ঞানের উদ্‌ভব হইয়াছে তাহাকে কি প্রজনতত্ত্ব নাম দেওয়া যাইতে পারে? আমি genetics শব্দের বাংলা করিয়াছি সৌজাত্যবিদ্যা।

এই প্রজনতত্ত্বের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় heredity। বাংলায় ইহাকে বংশানুগতি এবং inherited শব্দকে বংশানুগত বলা চলে। কিন্তু inheritance–কে কী বলা যাইবে? বংশাধিকার অথবা উত্তরাধিকার inheritable–বংশানুলোম্য।

Adaptation শব্দকে আমি অভিযোজন নাম দিয়াছি। নিজের surroundings-এর সহিত adaptation–নিজের পরিবেষ্টনের সহিত অভিযোজন। Adaptability–অভিযুজ্যতা। Adaptable–অভিযোজ্য। Adapted¬-অভিযোজিত।

৫

কয়েকটি ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ স্থির করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া একজন পত্র লিখিয়াছেন।

১

প্রশ্ন। I envy you your interest in art। এখানে interest শব্দের অর্থ কী?

উত্তর। বলা বাহুল্য interest শব্দের অনেকগুলি ভিন্ন অর্থ আছে। বাংলায় তাহাদের জন্য পৃথক শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। এখানে উক্ত ইংরেজি শব্দের স্থলে বাংলায় ‘অনুরক্তি’ শব্দ ব্যবহার করা চলে।

২

প্রশ্ন। Attention is either spontaneous or reflex। এখানে spontaneous ও reflex শব্দের প্রতিশব্দ কী হওয়া উচিত?

উত্তর। Spontaneous–স্বতঃসৃত। Reflex–প্রতিক্ষিপ্ত।

৩

প্রশ্ন। Forethought -এর প্রতিশব্দ কী?

উত্তর। প্রসমীক্ষা, প্রসমীক্ষণ, পূর্ব-বিচারণা।

৪

প্রশ্ন। ‘By suggestion I can cure you’. ‘The great power latent in this form of suggestiveness is wellknown’. Suggestion ও suggestiveness-এর প্রতিশব্দ কী?
উত্তর। সাধারণত বাংলায় suggestion ও suggestiveness-এর প্রতিশব্দ ব্যঞ্জনা ও ব্যঞ্জনাশক্তি চলিয়া গিয়াছে। কোনো বিশেষ বাক্যপ্রয়োগে শব্দার্থের অপেক্ষা ভাবার্থের প্রাধান্যকে ব্যঞ্জনা বলা হয়। কিন্তু এখানে ‘suggestion’ শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে, আভাসের দ্বারা একটা চিন্তা ধরাইয়া দেওয়া। এ স্থলে ‘সূচনা’ ও ‘সূচনাশক্তি’ শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৫

প্রশ্ন। ‘Instinct similar to the action inspired by suggestion’ ইহার অনুবাদ কী? উত্তর। সূচনার দ্বারা প্রবর্তিত যে মানসিক ক্রিয়া তাহারই সমজাতীয় সহজ প্রবৃত্তি। বলা বাহুল্য আমাদের পত্রে আমরা যে প্রতিশব্দের বিচার করি তাহা পাঠকদের নিকট হইতে তর্ক-উদ্দীপন করিবার জন্যই। সকল

প্রতিশব্দের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষমতা আমাদের নাই।

৬

কয়েকটি চিঠি পাইয়াছি তাহাতে পত্রলেখকগণ বিশেষ কতকগুলি ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ জানিতে চাহিয়াছেন। নূতন একটা শব্দ যখন বানানো যায় তখন অধিকাংশ লোকের কানে খট্‌কা লাগে। এইজন্য অনেকে দেখি রাগ করিয়া উঠেন। সেইজন্য বার বার বলিতেছি আমাদের যেমন শক্তিও অল্প অভিমানও তেমনি অল্প। কেহ যদি কোনো শব্দ না পছন্দ করেন দুঃখিত হইব না। ভাষায় যে-সব ভাবপ্রকাশের দরকার আছে তাহাদের জন্য উপযুক্ত শব্দ ঠিক করিয়া দেওয়া একটা বড়ো কাজ। অনেকে চেষ্টা করিতে করিতে তবে

ইহা সম্পন্ন হইবে; আমাদের চেষ্টা যদি এক দিকে ব্যর্থ হয় অন্য দিকে সার্থক হইবে। চেষ্টার দ্বারা চেষ্টাকে উত্তেজিত করা যায়, সেইটেই লাভ। এইজন্যই, কোনো ওস্তাদীর আড়ম্বর না করিয়া আমাদের সাধ্যমত পত্রলেখকদের প্রেরিত ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ভাবিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি।

পূর্ববারে লিখিয়াছি হিপ্নটিজ্‌ম্‌ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত suggestion শব্দের প্রতিশব্দ ‘সূচনা’। আমরা ভাবিয়া দেখিলাম সূচনা শব্দের প্রচলিত ব্যবহারের সহিত ইহার ঠিক মিল হইবে না। তাই ইংরেজি suggestion-এর স্থলে ‘অভিসংকেত’ শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি। অভি উপসর্গ দ্বারা কোনো-কিছুর অভিমুখে শক্তি বা গতি বা ইচ্ছা প্রয়োগ করা বুঝায়; ইংরেজি towards-এর সহিত ইহার মিল। অভ্যর্থনা, অভিনন্দন, অভিযান, অভিপ্রায় প্রভৃতি শব্দ তাহার প্রমাণ। Auto-suggestion শব্দের প্রতিশব্দ স্বাভিসংকেত হইতে পারে। একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “আমরা কথায় বলি ‘তোমায় কয়েকটি উপায় suggest করতে পারি’ এ ক্ষেত্রে বাংলায় কী বলিব?” একটা কথা মনে রাখা দরকার, কোনো টাট্‌কা তৈরি কথা চলিত কথাবার্তায় অদ্ভুত শোনায়! প্রথমে যখন সাহিত্যে খুব করিয়া চলিবে, তখন মুখের কথায় ধীরে ধীরে তাহার প্রবেশ ঘটিবে। ‘অভিসংকেত’ কথাটা যদি চলে তবে প্রথমে বইয়ে চলিবে। “কয়েকটি উপায় অভিসংকেত করা যাইতে পারে” লিখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

উক্ত লেখকই প্রশ্ন করিয়াছেন “ Adaptability-র বাংলা কী হইতে পারে? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ‘অভিযুজ্যতা’। একজন সংস্কৃত’ পাঠক তাঁহার পত্রে জানাইয়াছেন, “উপযোগিতাই ভালো।” উপযোগিতা বলিতে suitability বুঝায়। যাহা উপযুক্ত তাহা স্বভাবতই উপযুক্ত হইতে পারে কিন্তু adapt করা চেষ্টাসাপেক্ষ। ‘অভিযোজিত’ বলিলে সহজেই বুঝায় একটা-কিছুর অভিমুখে যাহাকে যোজনা করা হইয়াছে, যাহা সহজেই যুক্ত তাহার সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ আছে। আর-একজন পণ্ডিত লিখিয়াছেন—‘যোজিত’ অপেক্ষা ‘যুক্ত’ই ব্যাকরণসম্মত। আমরা ব্যাকরণ সামান্যই জানি কিন্তু আমাদের নজির আছে—

পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্তঃ
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।

প্রশ্ন : Paradox শব্দের বাংলা আছে কি?

নাই বলিয়াই জানি। শব্দ বানাইতে হইবে, ব্যবহারের দ্বারাই তাহার অর্থ পাকা হইতে পারে। বিসংগত সত্য বা বিসংগত বাক্য এই অর্থে চালাইলে চলিতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করি।

Parody—ব্যঙ্গানুকরণ।

Amateur শব্দের একটা চলতি বাংলা ‘অব্যবসায়ী’। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু যেন নিন্দার ভাব আছে। তাহা ছাড়া ইহাতে অভ্যস্ত দক্ষতার অভাবমাত্র বুঝায় কিন্তু অনুরাগ বুঝায় না। ইংরেজিতে কখনো কখনো সেইরূপ নিন্দার ভাবেও এই শব্দের ব্যবহার হয়, তখন অব্যবসায়ী কথা চলে। অন্য অর্থে শখ শব্দ বাংলায় চলে, যেমন শখের পাঁচালি, শখের যাত্রা। ব্যবহারের সময় আমরা বলি শৌখিন। যেমন শৌখিন গাইয়ে।

প্রশ্নকর্তা লিখিতেছেন, “Violet কথাটার বাংলা কী? নীলে সবুজে মিলিয়া বেগুনি, কিন্তু নীলে লালে মিলিয়া কী?”

আমার ধারণা ছিল নীলে লালে বেগুনি। ভুল হইতেও পারে। সংস্কৃতে Violet শব্দের প্রতিশব্দ পাটল বলিয়া জানি।

পত্রলেখক romantic শব্দের বাংলা জানিতে চহিয়াছেন। ইহার বাংলা নাই এবং হইতেও পারে না। ইংরেজিতে এই শব্দটি নানা সূক্ষ্মভাবে এমনি পাঁচরঙা যে ইহার প্রতিশব্দ বানাইবার চেষ্টা না করিয়া মূল শব্দটি গ্রহণ করা উচিত।

লেখক dilettante শব্দের বাংলা জানিতে চাহিয়াছেন। মোটামুটি পল্লবগ্রাহী

বলা চলে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরো যে-সব ভাবের আভাস আছে বাংলা শব্দে তাহা পাওয়া যাইবে না। প্রত্যেক ভাষাতেই এমন বিস্তর শব্দ আছে যাহা তাহার মোটা অর্থের চেয়ে বেশি কিছু প্রকাশ করে। সেইরূপ ফরাসি অনেক শব্দের ইংরেজি একেবারেই নাই। আমার মনে আছে—একদা ভগিনী নিবেদিতা আমার নিম্নলিখিত গানের পদটি দুই ঘণ্টা ধরিয়া তর্জমা করিবার চেষ্টা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—

নিশিদিন ভরসা রাখিস,
ওরে মন, হবেই হবে।

প্রথম বাধিল 'ভরসা' কথা লইয়া। ভরসা কথার সঙ্গে দুটো ভাব জড়ানো, confidence এবং courage। কিন্তু ইংরেজি কোনো এক শব্দে এই দুটো ভাব ঠিক এমন করিয়া মেলে না। Faith, trust, assurance কিছুতেই না। তার পরে 'হবেই হবে' কথাটাকে ঠিক অমন করিয়া একদিকে অস্পষ্ট রাখিয়া আর-এক দিকে খুব জোর দিয়া বলা ইংরেজিতে পারা যায় না। এ স্থলে ইংরেজিতে একটু ঘুরাইয়া বলা চলে—

Keep thy courage of Faith, my heart
And thy dreams will surely come true

৭

....Two mindedness—কে দ্বৌমানসিকতা বললে কি রকম হয়? কিংবা Two minded=দ্বৈতমনা, ও Two mindedness=দ্বৈতমানস।.১

১-২ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র

৮

মহান = Sublime মহিমা = Sublimity সৌন্দর্য ও মহিমা—এইটেই ভালো লাগ্‌চে। ভূমা শব্দের অসুবিধা অনেক। কারণ বিশেষ্য বিশেষণ একই হওয়া

ব্যবহারের পক্ষে একেবারেই ভালো নয়।....২

৯

আমার শরীর ও মনের অটুট কুঁড়েমি শেষ নৈষ্কর্ম্য রাত্রির পূর্বসন্ধ্যা বলে ধরে নিতে পারো। এই নৈঃশব্দ্যের যুগে আমার কাছে শব্দসৃষ্টির প্রত্যাশা নিয়ে এসেছ, কুণ্ঠিত করেছ আমার লেখনীকে। রচনার প্রসঙ্গে পরিভাষা যখন আপনি এসে পড়ে তখন সেটা মাপসই মানানসই হয়। পা রইল এ পাড়ায় আর জুতো তৈরি হচ্ছে ও পাড়ায় ব্যবহারের পক্ষে এটা অনেক সময়েই পীড়াজনক ও ব্যর্থ হয়। অপর পক্ষে নতুন জুতো প্রথমটা পায়ে আঁট হলেও চলতে চলতে পা তাকে নিজের গরজে আপনার মাপের করে নেয়। পরিভাষা সম্বন্ধেও সেরকম প্রায়ই ঘটে।

Harmony–স্বরসংগম বা স্বরসংগতি।
Concord–স্বরৈক্য
Discord–বিস্বর
Symphony–ধ্বনিমিলন
Symphonic–সংধ্বনিক

সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় যেখানে সহজে সাড়া না দেয় সেখানে মূল শব্দের শরণ নিয়ো। ভাষায় ম্লেচ্ছ সংস্রবদোষ একদা গর্হিত ছিল। এখন সেদিন নেই–এখন ভাষার অন্নিবাসে ফিরিঙ্গিতে বাঙালিতে ঘেঁষাঘেষি বসে।১

১০

. . .আমার মতে “স্বপ্নাঞ্চিত” কথাটা অন্তত এখনো চলনসই হয় নি–রোমাঞ্চিত কথাটার মানে, রোম carved হয়ে ওঠা–আমি তৃণাঞ্চিত কথা ব্যবহার করেচি–সেটা যদিও অচলিত তবু অচলনীয় নয়। মঞ্জীরকে “তিক্ত” বল্‌লে ভাষায় ফিরিঙ্গি গন্ধ লাগে। ইংরেজিতে bitter কথাটা রসনাকে ছাড়িয়ে হৃদয় পর্যন্ত প্রবেশ করে–বাংলায় “তীব্র” কথাটা স্বাদে এবং ভাবে আনাগোনা করে কিন্তু তিক্ত কথাটাকে অন্তত নূপুরের বিশেষণরূপে চালাবার পূর্বে

তোমার কবিযশকে এখনো অনেক দূর সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরিব্যাপ্ত করতে হবে। “স্বীকৃতির” পরিবর্তে খ্যাতি বলাই ভালো। “সুগুপ্ত” কথাটা আমার কানে অত্যন্ত পীড়ন সঞ্চার করে। যেখানে গুপ্ত শব্দের সঙ্গে সু বিশেষণের সংগতি আছে সেখানে দোষ নেই। অনেকে খামকা সু-উচ্চ কথা ব্যবহার করে কিন্তু ওতে কেবল ছন্দোরক্ষার অনাচার প্রকাশ পায়।...২

১-২- দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্র

১১

The Voice কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ চাও। বাণী ছাড়া আর কোনো শব্দ মনে পড়ে না। আমাদের ভাষায় আকাশবাণী দৈববাণী প্রভৃতি কথার ব্যবহার আছে। শুধু “বাণী” কথাটিকে যদি যথেষ্ট মনে না কর তবে “মহাবাণী” ব্যবহার ক’রতে পারো।...৩

১২

আমার মনে হয় নেশান, ন্যাশনাল প্রভৃতি শব্দ ইংরেজিতেই রাখা ভালো। যেমন অক্সিজেন হাইড্রোজেন। ওর প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। রাষ্ট্রজন কথাটা চালানো যেতে পারে। রাষ্ট্রজনিক এবং রাষ্ট্রজনিকতা শুন্‌তে খারাপ হয় না। আমার মনে হয় রাষ্ট্রজনের চেয়ে রাষ্ট্রজাতি সহজ হয়। কারণ নেশন অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার বহুল পরিমাণে চ’লে গেছে। সেই কারণেই রাষ্ট্রজাতি কথাটা কানে অত্যন্ত নতুন ঠেকবে না।

Caste–জাত
Race–জাতি
Population–প্রজন১
Nation–রাষ্ট্রজাতি
People–জনসমূহ

১৩

দুরূহ আপনার ফরমাস। Broadcast-এর বাংলা চান। আমি কখনো কখনো

ঠাট্টার সুরে বলি আকাশবাণী।২ কিন্তু সেটা ঠাট্টার বাইরে চলবে না।...

সীরিয়াসভাবে যদি বলতে হয় তা হলে একটা নতুন শব্দ বানানো চলে। বলা বাহুল্য পারিভাষিক শব্দ পুরোনো জুতো বা পুরোনো ভৃত্যের মতো—ব্যবহার করতে করতে তার কাছ থেকে পুরো সেবা পাওয়া যায়।

“বাক্‌প্রসার” শব্দটা যদি পছন্দ হয় টুকে রাখবেন, পছন্দ না যদি হয় তা হলেও দুঃখিত হবো না। ওর চেয়ে ভালো কথা যদি পান তবে তার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।

১৪

শরীর ভালো ছিল না, ব্যস্ত ছিলাম, তার উপরে তোমার প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন, যে চারটে শব্দ তর্জমা করতে অনুরোধ করেছ

৩- ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে লিখিত পত্র

১- রেবতীমোহন বর্মনকে লিখিত পত্র

২ ‘ধরার আঙিনা হতে ঐ শোনো উঠিল আকাশবাণী’ কবিতায় (৫ অগস্ট ১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথ শব্দটি ব্যবহার করেন। নলিনীকান্ত সরকার- প্রণীত ‘শ্রদ্ধাস্পদেষু’ গ্রন্থে (১৮৭৯ শকাব্দ) “রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্ধে কবিতাটি উদ্ধৃত ও রচনার প্রসঙ্গ আলোচিত।

৩- চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র

সেগুলি যদি সশ্রম কারাদণ্ডে ব্যবহার করতে দিতে তা হলে তিন-চার মাসের মেয়াদ ভর্তি হতে পারত।
Intellectual friendship শব্দের ভাষান্তরে তোমাদের প্রস্তাব ‘আধিমানসিক

মিত্রতাবোধ'। আপত্তি এই, মিত্রতা মানসিক হবে না তো আর কি হতে পারে? মানসিক শব্দের অর্থ intellectual-এর চেয়ে ব্যাপক-বস্তুত ওর ইংরেজী হচ্ছে mental। Intellect-কে বুদ্ধি বল্‌লে বোঝা সহজ হয় বুদ্ধিগত বা বুদ্ধিমূলক বা বুদ্ধিপ্রধান মৈত্রী অথবা মৈত্রীবোধ বল্‌লে কানে খটকা লাগবে না। ওর প্রতিকূল হচ্ছে emotional অর্থাৎ ভাবপ্রধান বা হৃদয়প্রধান।

Cultural self শব্দটাকে তর্জমা করা আরো দুঃসাধ্য। তোমাদের প্রস্তাব হচ্ছে 'আধি সাংস্কৃতিক'। এর ঠিক মানেটা আন্দাজ করা অসম্ভব বললেই হয়। প্রথমত culture শব্দের বাংলা একটি করতে হবে। আমি বলি মনঃপ্রকর্ষ বা চিত্রপ্রকর্ষ বল্‌লে ভাবখানার একটা ইসারা পাওয়া যায়। cultured লোককে বলা যেতে পারে প্রকৃষ্টচিত্ত বা প্রকৃষ্টমনা। যদি বলতে হয় অঙ্কশাস্ত্রে তিনি cultured তা-হলে বাংলায় বলবে অঙ্কশাস্ত্রে তিনি প্রকর্ষপ্রাপ্ত। অমুক পরিবারে culture-এর atmosphere আছে বলতে হলে বলা যেতে পারে, অমুক পরিবারে মনঃপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষের আবহাওয়া আছে। কৃষ্টি কথাটা আমার কানে একটুও ভালো লাগে না। বরঞ্চ উৎকৃষ্টি[১] বল্‌লেও কোনোমতে চলত।

যা হোক আমার মতে cultural self-কে চিত্তপ্রকর্ষগত বা মনঃপ্রকর্ষগত সত্তা বা ব্যক্তিত্ব বলা যায়। আরো দুটো কথা দিয়েছ intellectual passion, intellectual self। সংরাগ শব্দকে আমি passion অর্থে ব্যবহার করি। অতএব আমার মতে intellectual passion -কে বুদ্ধিগত সংরাগ ও intellectual self-কে বুদ্ধিগত ব্যক্তিত্ব বল্‌লে ভাবটা বুঝতে বাধবে না। যাই হোক বহুল ব্যবহার ছাড়া এ-সব শব্দ ভাষায় প্রাণবান হয়ে ওঠে না। বলা বাহুল্য physical culture-কে বলতে হবে দেহপ্রকর্ষ চর্চা।[২]

১৫

ভূতত্ত্বের পরিভাষা আলোচনা আমার পক্ষে অসাধ্য। Fossil শব্দকে শিলক ও Fossilized—কে শিলীকৃত বলা চলে। Sub-man-কে অবমানব বললেই ভালো হয়। প্রাতর্‌ ও প্রত্যুষ শব্দের যোগে যে শব্দ বানিয়েছ কানে অসংগত ঠেকে। প্রাতর্‌ শব্দের পরিবর্তে প্রথম বা প্রাক্‌ ব্যবহার করলে চলে না কি, Eolith

=প্রাক্‌প্রস্তর। Eoanthropus=প্রাক্‌মানব। Eocene=প্রাগাধুনিক। Proterozoic=পরাজৈবিক।৩

১৬

পরিভাষা সংকলনের কাজ আপনি যে নিয়মে চালাচ্ছেন সে আমার অনুমোদিত। আপনার কাজ শেষ হতে দীর্ঘকাল লাগবে। কিন্তু বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে অধিক দেরি করা চলবে না। বই যাঁরা লিখ্‌বেন তাঁদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিদের হাতেই পরিভাষার চরম নির্বাচন ও প্রচলন নির্ভর করে; উপস্থিত মতো যথাসম্ভব তাঁদের সাহায্য করবার কাজে আমরা প্রবৃত্ত হয়েছি। ভাষায় সব সময়ে যোগ্যতমের নির্বাচন নীতি খাটে না—অনেক সময়ে অনেক আকস্মিক কারণে অযোগ্য শব্দ টিঁকে যায়। সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে তাড়া—শেষ পর্যন্ত বিচার করবার সময় যখন পাওয়া যায় না তখন আপাতত কাজ সারার মতো শব্দগুলো চিরস্বত্ব দখল করে বসে। আমার মনে হয় যথাসম্ভব সত্বর কাজ করা উচিত—কাজ চলতে চলতে ভাষা গড়ে উঠবে—তখন পারিভাষিক শব্দগুলি অনেক স্থলে প্রথার জোরেই ব্যাকরণ ডিঙিয়ে আপন অর্থ স্থির করে নেবে। ***১

১৭

যখন কোনো ইংরেজি শব্দের নূতন প্রতিশব্দ রচনা করতে বসি তখন প্রায় ভুলে যাই যে অনেক সময়ে সে শব্দের ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। Background, ছবি সম্বন্ধে এক মানে, বিষয় সম্বন্ধে অন্য মানে, আবার কোনো কোনো জায়গায় ওই শব্দে বোঝায় প্রচ্ছন্ন বা অনাদৃত স্থান। পটভূমিকা শব্দটা আমিই প্রথমে যে জায়গায় ব্যবহার করেছিলেম সেখানে তার সার্থকতা ছিল।

---

১ দ্রষ্টব্য : ‘কালচার ও সংস্কৃতি’
২সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিকিত পত্র
৩ সতীশরঞ্জন খাস্তগীরকে লিখিত পত্র

পশ্চাদ্ভূমিকা বা পৃষ্ঠাশ্রয় হয়তো অধিকাংশ স্থলে চলতে পারে। “শিশিরবাবুর নাটকে গানের অনুভূমিকা বা পশ্চাদ্ভূমিকা” বললে অসংগত শোনায় না। বলা বাহুল্য নতুন তৈরি শব্দ নতুন জুতোর মতো ব্যবহার করতে করতে সহজ হয়ে আসে। “এই নভেলের ঐতিহাসিক পশ্চাদ্ভূমিকা” বললে অর্থবোধের বিঘ্ন হয় না। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে এ-সকল স্থানে ইংরেজির অবিকল অনুবাদের প্রয়োজন কী? এ স্থলে যদি বলা যায়—ঐতিহাসিক ভূমিকা বা ভিত্তি তা হলে তাতে কি নালিশ চলে—কোনোমতে ওই ‘পশ্চাৎ’ শব্দটা কি জুড়তেই হবে? আশ্রয় বা আশ্রয়বস্তু কথাটাও মন্দ নয়। ইংরেজিতেও অনেক সময়ে একই অর্থে foundation বললেও চলে, background বললেও চলে, support বললেও চলে।

“কায়াচিত্র”২ Tableau-এর ভালো অনুবাদ সন্দেহ নেই।

Allusion এবং reference অধিকাংশ স্থলেই সমার্থক। বাংলা করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করতে হবে—যেমন সংকেত, লক্ষ্য, উদ্দেশ, উদাহরণ। বলা যেতে পারে, মল্লিনাথের টীকায় দিঙ্‌নাগাচার্যের সমুদ্দেশ পাওয়া যায়। Reference স্থলবিশেষে পরিচয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন certificate -এর সমর্থক reference।

“সুমেরিয় ইতিহাসে ইন্দ্র দেবতার allusion আছে,” এখানে allusion যদি অস্পষ্ট হয় তবে সেটা ইঙ্গিত, যদি স্পষ্ট হয় তবে সেটা উদাহরণ। Alluding to his character—”তাঁর চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে।” মোটের উপর অভিনির্দেশ অভিসংকেত শব্দ দ্বারা reference -এর allusion -এর অর্থ বোঝানো যেতে পারে। রক্তকরবীর নন্দিনীকে লক্ষ্য ক’রে যদি ‘art’ শব্দ ব্যবহার করতে হয় তা হলে বলা উচিত ‘কলারূপিণী’। Technical term -এর প্রচলিত বাংলা—পারিভাষিক শব্দ। ****৩

Relief শব্দের প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ উৎকীর্ণ-চিত্র—যদি অক্ষর হয় তবে উৎকীর্ণ লিপি।

১- জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ীকে লিখিত পত্র
২ পত্রলেখক-কর্তৃক প্রস্তাবিত ও রাজশেখর বসু-কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিশব্দ
৩ ক্ষিতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র
Proximo ও Ultimo শব্দের সহজ প্রতিশব্দ গত মাসিক ও আগামী মাসিক। ২

২০

....Image কথাটার প্রতিশব্দ প্রতিমা—স্থান বিশেষে আর কিছুও হোতে পারে।৩

২- নিত্যানন্দ সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র
৩- ভবানীপ্রসাদ বাগচীকে লিখিত পত্র

বাংলা কথ্যভাষা

বাংলা শব্দতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে বাংলা দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রচলিত উচ্চারণগুলির তুলনা আবশ্যক। অনেক বাংলা শব্দের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কৃতকার্য হওয়া যায় না। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উচ্চারিত শব্দগুলি মিলাইয়া দেখিলে সেই মূল ধরিতে পারা সহজ হইতে পারে। তাহা ছাড়া উচ্চারণতত্ত্বটি শব্দতত্ত্বের একটি প্রধান অঙ্গ। স্বর ও ব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির কী নিয়মে বিকার ঘটে তাহা ভাষাতত্ত্বের বিচার্য। এজন্যও ভিন্ন জেলার উচ্চারণের তুলনা আবশ্যক। বাংলা দেশের প্রায় সকল জেলা হইতেই আমাদের আশ্রমে ছাত্রসমাগম হইয়াছে। তাঁহাদের সাহায্যে বাংলা ধাতুরূপ ও শব্দরূপের তুলনা-তালিকা আমরা বাহির করিতে চাই। নীচে আমরা যে তালিকা দিতেছি তাহার অবলম্বন কলিকাতা বিভাগের বাংলা। পাঠকগণ ইহা

অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ প্রদেশের উচ্চারণ-অনুযায়ী শব্দতালিকা পাঠাইলে আমাদের উপকার হইবে।

কলিকাতা বিভাগের শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা আবশ্যক। যখন ‘বালক’ পত্র প্রকাশ করিতাম সে অনেক দিনের কথা। তখন সেই পত্রে বাংলা শব্দোচ্চারণের কতকগুলি নিয়ম লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। আমার সেই আলোচিত উচ্চারণপদ্ধতি কলিকাতা বিভাগের। স্থলবিশেষে বাংলায় অকারের উচ্চারণ ওকারঘেঁষা হইয়া যায় ইহা আমার বিচারের বিষয় ছিল। ‘করা’ শব্দের ক্-সংলগ্ন অকারের উচ্চারণ এবং ‘করি’ শব্দের ক্-সংলগ্ন অকারের উচ্চারণ তুলনা করিলে আমার কথা স্পষ্ট হইবে—এ উচ্চারণ কলিকাতা বিভাগের সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কলিকাতার উচ্চারণে ‘মসী’ শব্দস্থিত অকার এবং ‘দোষী’ শব্দস্থিত ওকারের উচ্চারণ একই। ‘বোল্‌তা’ এবং ‘বলব’ও সেইরূপ। বাংলা উচ্চারণে কোনো ওকার দীর্ঘ কোনো ওকার হ্রস্ব; হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী ওকার দীর্ঘ এবং স্বরান্ত শব্দের পূর্ববর্তী ওকার হ্রস্ব। ‘ঘোর’ এবং ‘ঘোড়া’ শব্দের উচ্চারণ-পার্থক্য লক্ষ্য করিলেই ইহা ধরা পড়িবে। কিন্তু যেহেতু বাংলায় দীর্ঘ-ও হ্রস্ব-ও একই ওকার চিহ্নের দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে সেইজন্য নিম্নের তালিকায় এইসকল সূক্ষ্ম প্রভেদগুলি বিশেষ চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিলাম না।

আমরা প্রথমে ক্রিয়াপদের তালিকা দিতেছি। বাংলায় একবচনে ও বহুবচনে ক্রিয়ার প্রকৃতির কোনো পার্থক্য ঘটে না বলিয়াই জানি, এইজন্য নীচের তালিকায় বহুবচনের উল্লেখ নাই। যদি কোনো জেলায় বহুবচনের বিশেষ রূপ থাকে তবে তাহা নির্দেশ করা আবশ্যক।

এইখানে হসন্ত উচ্চারণ সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার। বাংলায় সাধারণত শব্দের শেষবর্ণস্থিত অকারের উচ্চারণ হয় না। যেখানে উচ্চারণ হয় সেখানে তাহা ওকারের মতো হইয়া যায়। যেমন ‘বন’, ‘মন’, এ শব্দগুলি হসন্ত। ‘ঘন’ শব্দটি হসন্ত নহে। কিন্তু উচ্চারণ হিসাবে লিখিতে হইলে লেখা উচিত, ঘনো। ‘কত’=কতো। ‘বড়’=বড়ো। ‘ছোট’=ছোটো। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি বাংলায়

দুই অক্ষরের বিশেষণমাত্রই এইরূপ স্বরান্ত। বাংলায় হসন্তের আর-একটি নিয়ম আছে। বাংলায় যে অসংযুক্ত শব্দের পূর্বে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে সে শব্দ নিজের অকার বর্জন করে। ‘পাগল্’ শব্দের গ আপন অকার রক্ষা করে যেহেতু পরবর্তী ল-এ কোনো স্বর নাই। কিন্তু ‘পাগ্‌লা’ বা ‘পাগ্‌লী’ শব্দে গ অকার বর্জন করে। এইরূপ—আপন—আপ্‌নি, ঘটক—ঘট্‌কী, গরম—গর্‌মি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, অনতিপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দে এ নিয়ম খাটে না, যেমন ঘোটক—ঘোটকী। এইপ্রকার হসন্ত সম্বন্ধে বাংলায় সাধারণ নিয়মের যখন প্রায় ব্যতিক্রম দেখা যায় না তখন আমরা এরূপ স্থলে বিশেষভাবে হসন্তচিহ্ন দিব না—যেমন ‘করেন্’ না লিখিয়া ‘করেন’ লিখিব, ‘কোর্‌চেন’ না লিখিয়া ‘কোরচেন’ লিখিব।

আমি কোরি তুই কোরিস আমি কোরচি তুই কোরচিস
আমি কোরি তুই কোরিস আমি কোরচি তুই কোরচিস
তুমি করো সে করে তুমি কোরচ সে কোরচে
আপনি করেন তিনি করেন আপনি কোরচেন তিনি কোরচেন
আমি কোরলুম (কোরলেম) তুই কোরলি
তুমি কোরলে সে কোরল (করেছিলেম)
আপনি কোরলেন তিনি কোরলেন
আমি কোরেচি তুই কোরেচিস আমি কোরেছিলুম (করেছিলেম)
তুমি কোরেচ সে কোরেচে তুমি কোরেছিলে
আপনি কোরেচেন তিনি কোরেচেন আপনি কোরেছিলেন
আমি কোরছিলুম (করছিলেম) তুই কোরছিলি
তুমি কোরেছিলে সে কোরেছিল
আপনি কোরছিলেন তিনি কোরেছিলেন
আমি কোরতুম (কোরতেম) তুই কোরতিস
তুমি কোরতে সে কোরত
আপনি কোরতেন তিনি কোরতেন
করা যাক্ তুমি করো তুই কর

তিনি কোরুন
করা হোক্ আপনি করুন সে করুক
আমি কোরব তুই কোরবি
তুমি কোরবে সে কোরবে
আপনি কোরবেন তিনি কোরবেন
করা হয়, করা যায়, কোরে থাকে, কোরতে থাকে, করা চাই, কোরতে হবে, কোরলোই বা (কোরলেই বা), নাই কোরলো (নাই কোরলে), কোরলেও হয়, কোরলেই হয়, কোরলেই হোলো, করানো, কোরে কোরে, কোরতে কোরতে।

হোয়ে পড়া, হোয়ে ওঠা, হোয়ে যাওয়া, কোরে ফেলা, কোরে ওঠা, কোরে তোলা, কোরে বসা, কোরে দেওয়া, কোরে নেওয়া, কোরে যাওয়া, করানো।

কেঁদে ওঠা, হেসে ওঠা, বোলে ওঠা, চেঁচিয়ে ওঠা, আঁৎকে ওঠা, ফস্‌কে যাওয়া, এড়িয়ে যাওয়া, চম্‌কে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, সেরে যাওয়া, সোরে যাওয়া, মোরে যাওয়া।

কর্তৃকারক

একবচন—রাম হাসে, বাঘে মানুষ খায়, ঘোড়ায় লাথি মারে, গোরুতে ধান খায়।

এইখানে একটা কথা পরিষ্কার করা দরকার। ‘রাম হাসে’ এই বাক্যে ‘রাম’ শব্দ কর্তৃকারক সন্দেহ নাই। কিন্তু ‘বাঘে মানুষ খায়’, ‘ঘোড়ায় লাথি মারে’, ‘গোরুতে ধান খায়’, বাক্যে ‘বাঘে’ ‘ঘোড়ায়’ ‘গোরুতে’ শব্দগুলি কর্তৃকারক এবং করণকারকের খিচুড়ি। ‘বাছুরে জন্মায় বা বাছুরে মরে’ এমন বাক্য বৈধ নহে, ‘বাছুরে তাকে চেটেচে’, চলে—অর্থাৎ এরূপ স্থলে কর্তার সঙ্গে কর্ম চাই। ‘ঘোড়ায় লাথি মারে’ বলি কিন্তু ‘ঘোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে’ বলি না। ‘লোকে নিন্দে করে’ বলি, কিন্তু ‘লোকে জমেচে’ না বলিয়া ‘লোক জমেচে’ বলি।

আরো একটি কথা বিবেচ্য, বাংলায় কর্তৃকারকের এই প্রকার করণঘেঁষা রূপ কেবল একবচনেই চলে, আমরা বলি না ‘লোকগুলোতে নিন্দে করে’। তার কারণ, লোকে, বাঘে, ঘোড়ায় প্রভৃতি প্রয়োগ একবচনও নহে বহুবচনও নহে, ইহাকে সামান্যবচন বলা যাইতে পারে। ইহার প্রকৃত অর্থ, লোকসাধারণ, ব্যাঘ্রসাধারণ, ঘোটকসাধারণ। যখন বলা হয় ‘রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব’, তখন ‘রাম ও রাবণ’ ব্যক্তিবিশেষের অর্থত্যাগ করিয়া জাতিবিশেষের অর্থ ধারণ করে।

কর্তৃকারক বহুবচন=রাখালেরা চরাচ্চে, গাছগুলি নড়চে, লোকসব চলেচে।

কর্ম–ভাত খাই, গাছ কাটি, ছেলেটাকে মারি।

এইখানে একটু বক্তব্য আছে। কর্মকারকে সাধারণত প্রাণীপদার্থ সম্বন্ধেই ‘কে’ বিভক্তি প্রয়োগ হয়। কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম আছে। যেমন, ‘এই টেবিলটাকে নড়াতে পারচি নে’ ‘সন্ন্যাসী লোহাকে সোনা করতে পারে’ ‘জিয়োমেট্রির এই প্রব্লেমটাকে কায়দা করতে হবে’ ইত্যাদি। অথচ ‘এই প্রব্লেমকে কষো, এই লোহাকে আনো, টেবিলকে তৈরি করো’ এরূপ চলে না। অতএব দেখিতেছি, অপ্রাণীবাচক শব্দের উত্তরে ‘টা’ বা ‘টি’ যোগ করিলে কর্মকারক তদুত্তরে ‘কে’ বিভক্তি হয়, যেমন ‘চৌকিটাকে সোরিয়ে দাও’ (‘চৌকিকে সোরিয়ে দাও’ হয় না) ‘গাছটাকে কাটো’ (গাছকে কাটো’ হয় না)। ইহাতে বুঝা যাইতেছে ‘টি’ বা ‘টা’ যোগ করিলে শব্দবিশেষের অর্থ এমন একটা সুনির্দিষ্টতার জোর পায় যে তাহা যেন কতকটা প্রাণের গৌরব লাভ করে। ‘লোহাকে সোনা করা যায়’, বাক্যে ‘লোহা’ সেইরূপ যেন ব্যক্তিবিশেষের ভাব ধারণ করিয়াছে।

করণ–ছড়ি দিয়ে মারে, মাঠ দিয়ে যায়, হাত দিয়ে খায়, ঘোলে দুধের সাধ মেটে না, কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কানে শোনে না।

অপাদান–রামের চেয়ে (চাইতে) শ্যাম বড়ো, এ গাছের থেকে ও গাছটা বড়ো, তোমা হোতেই এটা ঘট্‌ল, ঘর থেকে বেরোও।’

সম্বন্ধ–গাছের পাতা, আজকের কথা, সেদিনকার ছেলে।
অধিকরণ–নদীতে জল, লতায় ফুল, পকেটে টাকা।
বাংলায় কর্তৃকারক ছাড়া অপর কারকে বহুবচনসূচক কোনো চিহ্ন নাই।

সর্বনাম

কর্তা–আমি আমরা, তুমি তোমরা, আপনি আপনারা, সে তারা, তিনি তাঁরা, এ এরা, ইনি এঁরা, ও ওরা, উনি ওঁরা, কে কারা, যে যারা, কি কিসব কোন্‌গুলো, যা যা'সব যেগুলো, তা সেইসব সেইগুলো।

কর্ম–আমাকে আমাদের তোমাকে তোমাদের (দিগকে), আপনাকে আপনাদের, তাকে তাদের, তাঁকে তাঁদের, একে এদের, এঁকে এঁদের, ওঁকে ওঁদের, কাকে কাদের, কোন্‌টাকে কোন্‌গুলোকে, যাকে যাদের, যেটাকে যেগুলোকে, সেটাকে সেগুলোকে।

করণ–আমাকে দিয়ে, তাকে দিয়ে, কোন্‌টাকে দিয়ে, ইত্যাদি। কেন, কিসে, কিসে কোরে, কি দিয়ে; যাতে, যাতে কোরে, যা দিয়ে; তাতে, তাতে কোরে, তা দিয়ে ইত্যাদি।

অপাদান–আমার চেয়ে এটা ভালো, আমা হতে এ হবে না, আমার থেকে ও বড়ো, এটার চেয়ে, ওটা থেকে ইত্যাদি।

সম্বন্ধ–আমার তোমার তার এগুলোর ওগুলোর ইত্যাদি।

অধিকরণ–আমাতে তোমাতে, এটাতে ওটাতে, আমায় তোমায়, আমাদের

মধ্যে, এগুলোতে ইত্যাদি। এখন তখন যখন কখন, এমন তেমন কেমন যেমন অমন, অত তত যত, এখানে যেখানে সেখানে।

২

বাংলায় কথার ভাষা আর লেখার ভাষা নিয়ে যে তর্ক কিছুকাল চলছে আপনি আমাকে সেই তর্কে যোগ দিতে ডেকেছেন। আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বলে এ কাজে আমি উৎসাহ বোধ করছি নে। সংক্ষেপে দুই-একটা কথা বলব।

কর্ণ অর্জুন উভয়ে সহোদর ভাই হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যখন জাতিভেদ ঘটেছিল, একজন রইল ক্ষত্রিয় আর-একজন হ'ল সূত, তখনি দুই পক্ষে ঘোর বিরোধ বেধে গেল। বাংলা লেখায় আর কথায় আজ সেই দ্বন্দ্ব বেধে গেছে। এরা সহোদর অথচ এদের মধ্যে ঘটেছে শ্রেণীভেদ; একটি হলেন সাধু, আর-একটি হলেন অসাধু। এই শ্রেণীভেদের কারণ ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সে কথাটা খুলে বলি।

এক সময়ে বাংলায় পদ্য সাহিত্যই একা ছিল; গদ্য ছিল মুখে; লেখায় স্থান পায় নি। পদ্যের ভাষা কোনো এক সময়কার মুখের ভাষার কাছ-ঘেঁষা ছিল সন্দেহ নেই—তার মধ্যে ‘করিতেছিলাম’ বা ‘আমারদিগের’ ‘এবং’ ‘কিম্বা’ ‘অথবা’ ‘অথচ’ ‘পরন্তু’র ভিড় ছিল না। এমন-কি, ‘মুই’, ‘করলুঁ’ ‘হৈনু’ ‘মোসবার প্রভৃতি শব্দ পদ্য ভাষায় অপভাষা বলে গণ্য হয় নি। বলা বাহুল্য, এ-সকল কথা কোনো এক সময়ের চলতি কথা ছিল। হিন্দী সাহিত্যেও দেখি কবীর প্রভৃতি কবিদের ভাষা মুখের কথায় গাঁথা। হিন্দীতে আর-একদল কবি আছেন, যাঁরা ছন্দে ভাষায় অলংকারে সংস্কৃত ছাঁদকেই আশ্রয় করেচেন। পণ্ডিতদের কাছে এঁরাই বেশি বাহবা পান। ইংরেজিতে যাকে snobbishness বলে এ জিনিসটা তাই। হিন্দী প্রাকৃত যথাসম্ভব সংস্কৃত ছদ্মবেশে আপন প্রাকৃতরূপ ঢাকা দিয়ে সাধুত্বের বড়াই করতে গিয়েচে। তাতে তার যতই মান বাড়ুক-না কেন, মথুরার রাজদণ্ডের ভিতর ফুঁ দিয়ে সে বৃন্দাবনের বাঁশি বাজাতে পারে নি।

যা হোক, যখন বাংলা ভাষায় গদ্যসাহিত্যের অবতারণা হল তার ভার নিলেন সংস্কৃত’ পণ্ডিত। দেশের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে প্রতিদিন যে গদ্য বাণী প্রবাহিত হচ্চে তাকে বহুদূরে রেখে সংস্কৃত সরোবর থেকে তাঁরা নালা কেটে যে ভাষার ধারা আনলেন তাকেই নাম দিলেন সাধুভাষা। বাংলা গদ্য সাহিত্যিক ভাষাটা বাঙালির প্রাণের ভিতর থেকে স্বভাবের নিয়মে গড়ে ওঠে নি, এটা ফরমাসে গড়া। বাঙালির রসময় রসনাকে ধিক্কার দিয়ে পণ্ডিতের লেখনী বলে উঠল গদ্য আমি সৃষ্টি করব। তলব দিলে অমরকোষকে মুগ্ধবোধকে। সে হল একটা অনাসৃষ্টি। তার পর থেকে ক্রমাগতই চেষ্টা চলচে কি ক’রে ভাষার ভিতরকার এই একটা বিদ্‌ঘুটে অসামঞ্জস্যটাকে মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যাসাগর তাকে কিছু পরিমাণে মোলায়েম ক’রে আনলেন—কিন্তু বঙ্গবাণী তবু বললেন “এহ বাহ্য”। তার পরে এলেন বঙ্কিম। তিনি ভাষার সাধুতার চেয়ে সত্যতার প্রতি বেশি ঝোঁক দেওয়াতে তখনকার কালের পণ্ডিতেরা দুই হাত তুলে বোপদেব অমরের দোহাই পেড়েছিলেন। সেই বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাও আজ প্রায় মরা গাঙের ভাষা হয়ে এসেচে—এখনকার সাহিত্যে ঠিক সে ভাষার স্রোত চলচে না। অর্থাৎ বাংলা গদ্যসাহিত্যের গোড়ায় যে একটা original sin ঘটেছে কেবলি সেটাকে ক্ষালন করতে হচ্চে। কৌলিন্যের অভিমানে যে একটা হঠাৎ সাধুভাষা সর্বসাধারণের ভাষার সঙ্গে জল-চল বন্ধ ক’রে কোণ-ঘেঁষা হয়ে বসেছিল, অল্প অল্প ক’রে তার পঙ্‌ক্তিভেদ ভেঙে দেওয়া হচ্চে। তার জাত যায়-যায়। উভয় ভাষায় কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে অসবর্ণ বিবাহ হতে শুরু হয়েচে। এখন আমরা চলিত কথায় অনায়াসে বলতে পারি ‘ম্যালেরিয়ায় কুইনীন ব্যবহার করলে সদ্য ফল পাওয়া যায়।’ পঞ্চাশ বছর আগে লোকের সঙ্গে ব্যাভার ছাড়া ব্যবহার কথাটা অন্য কোনো প্রসঙ্গেই ব্যবহার করতুম না। তখন বলতুম, ‘ম্যালেরিয়ায় কুইনীনটা খুব খাটে।’ আমার মনে আছে, আমার বাল্যকালে আমাদের একজন চাকরের মুখে ‘অপেক্ষা’ কথাটা শুনে আমাদের গুরুজনরা খুব হেসেছিলেন। কেননা, কেউ অপেক্ষা করচেন, এ কথাটা তাঁরাও বলতেন না—তাঁরা বলতেন ‘অমুক লোক তোমার জন্যে বসে আছেন।’ আবার এখানকার লেখার ভাষাতেও এমনি করেই মুখের ভাষার ছাঁদ কেবলি এগিয়ে চলছে। এক ভাষার দুই অঙ্গের মধ্যে অতি বেশি প্রভেদ থাকলে সেই

BANGLADARPAN.COM

অস্বাভাবিক পার্থক্য মিটিয়ে দেবার জন্যে পরস্পরের মধ্যে কেবলি রফা চলতে থাকে।

এ কথা সত্য ইংরেজিতেও মুখের ভাষায় এবং লেখার ভাষায় একেবারে ষোলো-আনা মিল নেই। কিন্তু মিলটা এতই কাছাকাছি যে পরস্পরের জায়গা অদলবদল করতে হলে মস্ত একটা লাফ দিতে হয় না। কিন্তু বাংলায় চলতি ভাষা আর কেতাবী ভাষা একেবারে এপার ওপার–ইংরেজিতে সেটা ডান হাত বাঁ হাত মাত্র-একটাতে দক্ষতা বেশি আর-একটাতে কিছু কম–উভয়ে একত্র মিলে কাজ করলে বেমানান হয় না। আমি কোনো কোনো বিখ্যাত ইংরেজ লেখকের ডিনার-টেবিলের আলাপ শুনেছি, লিখে নিলে ঠিক তাঁদের বইয়ের ভাষাটাকেই পাওয়া যেত, অতি সামান্যই বদল করতে হত। এই জাতিভেদের অভাবে ভাষার শক্তিবৃদ্ধি হয় আমার তো এই মত। অবশ্য মুখের ব্যবহারে ভাষার যে ভাঙচুর অপরিচ্ছন্নতা ঘটা অনিবার্য সেটাও যে লেখার ভাষায় গ্রহণ করতে হবে আমি তা মানি না। ঘরে যে ধুতি পরি সেই ধুতিই সভায় পরা চলে কিন্তু কুঁচিয়ে নিতে একটু যত্নের প্রয়োজন হয়, আর সেটা ময়লা হলে সৌজন্য রক্ষা হয় না। ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা।[১]

[১] বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্র।

প্রবাসী ১৩৫০ বৈশাখ সংখ্যায় কালিদাস নাগের নিম্নলিখিত মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয় : “...চিঠি যে ‘সবুজ-পত্র’ যুগে লেখা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও এই মূল্যবান চিঠিখানি তারিখ বর্জিত।

শব্দ-চয়ন : ১

বাংলা ভাষায় গদ্য লিখতে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিদিনই ঘটে। অনেক দিন ধরে অনেক রকম লেখা লিখে এসেছি সেই উপলক্ষে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হল। কিন্তু প্রায়ই মনের ভিতরে খটকা থেকে যায়। সুবিধা এই যে বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দবিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে উঠে, মূলে যেটা অসংগত, অভ্যাসে সেটা সংগতি লাভ করে। তৎসত্ত্বে সাহিত্যের হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয়, যা ভাষাকে যেন চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে। যেমন ‘সহানুভূতি’। এটা sympathy শব্দের তর্জমা। ‘সিম্প্যাথি’-র গোড়াকার অর্থ ছিল ‘দরদ’। ওটা ভাবের আমলের কথা, বুদ্ধির আমলের নয়। কিন্তু ব্যবহারকালে ইংরেজিতে ‘সিম্প্যাথি’-র মূল অর্থ আপন ধাতুগত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই কোনো একটা প্রস্তাব সম্বন্ধেও সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়। বাংলাতেও আমরা বলতে আরম্ভ করেছি ‘এই প্রস্তাবে আমার সহানুভূতি আছে’। বলা উচিত ‘সম্মতি আছে’ বা ‘আমি এর সমর্থন করি’। যা-ই হোক্– সহানুভূতি কথাটা যে বানানো কথা এবং ওটা এখনো মানান-সই হয় নি তা বেশ বোঝা যায় যখন ও শব্দটাকে বিশেষণ করবার চেষ্টা করি। ‘সিম্প্যাথেটিক্’-এর কী তর্জমা হতে পারে, ‘সহানুভৌতিক, বা ‘সহানুভূতিশীল’ বা ‘সহানুভূতিমান’ ভাষায় যেন খাপ খায় না-সেইজন্যেই আজ পর্যন্ত বাঙালি লেখক এর প্রয়োজনটাকেই এড়িয়ে গেছে। দরদের বেলায় ‘দরদী’ ব্যবহার করি, কিন্তু সহানুভূতির বেলায় লজ্জায় চুপ ক’রে যাই। অথচ সংস্কৃত ভাষায় এমন একটি শব্দ আছে, যেটা একেবারেই তথার্থক। সে হচ্ছে ‘অনুকম্পা’। ধ্বনিবিজ্ঞানে ধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্রের তারের মধ্যে সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়–যে সুরে বিশেষ কোনো তার বাঁধা, সেই সুর শব্দিত হলে সেই তারটি অনুধ্বনিত হয়। এই তো ‘অনুকম্পন’। অন্যের বেদনায় যখন আমার চিত্ত ব্যথিত হয়, তখন সেই তো ঠিক ‘অনুকম্পা’। ‘অনুকম্পায়ী’ কথাটা সংস্কৃতে আছে। ‘অনুকম্পাপ্রবণ’ শব্দটাও মন্দ শোনায় না। ‘অনুকম্পালু’ বোধ করি ভালোই চলে। মুশকিল এই যে, দখলের দলিলটাই ভাষায় স্বত্বের দলিল হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র এই কারণেই ‘কান, সোনা, চুন, পান’ শব্দগুলোতে মূর্ধন্য ণ-য়ের অনধিকার নিরোধ করা এত দুঃসাধ্য হয়েছে। ছাপাখানার

অক্ষর-যোজকেরা সংশোধন মানে না। তাদের প্রশ্ন করা যেতে পারত যে, কানের এক ‘সোনায়’ যদি মূর্ধন্য ণ লাগল, তবে অন্য ‘শোনায়’ কেন দন্ত্য ন লাগে। ‘শ্রবণ’ শব্দের র-ফলা লোপ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্ধন্য ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ মতেই দন্ত্য ন হয়েছে। অথচ ‘স্বর্ণ’ শব্দ যখন রেফ বর্জন ক’রে ‘সোনা’ হল, তখন মূর্ধন্য ণ-য়ের বিধান কোন্ মতে হয়? হাল আমলের নতুন সংস্কৃত-পোড়োরা ‘সোনা’কে শোধন ক’রে নিয়েছেন, তাঁদের স্বকল্পিত ব্যাকরণবিধির দ্বারা–এখন দখল প্রমাণ ছাড়া স্বত্বের অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য হয়ে গেল। ‘শ্রবণ’ শব্দের অপভ্রংশ শোনা শব্দ যখন বাংলা ভাষায় বানান-দেহ ধারণ করেছিল, তখন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিধানকর্তা ছিলেন –সেদিনকার বানানে কান সোনা প্রভৃতিরও মূর্ধন্যত্ব প্রাপ্তি হয় নি। কৃষ্ণ শব্দজাত কানাই শব্দে আজও দন্ত্য ন চলছে, বর্ণ (বর্ণ যোজন) শব্দজাত বানান শব্দে আজও মূর্ধন্য ণ-এর প্রবেশ ঘটে নি তাতে কি পাণ্ডিত্যের খর্বতা ঘটেছে?

কিছুকাল পূর্বে যখন ভারতশাসনকর্তারা ‘ইন্টার্ন্’ শুরু করলেন, তখন খবরের কাগজে তাড়াতাড়ি একটা শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেল–‘অন্তরীণ’। শব্দসাদৃশ্য ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো যুক্তি নেই। বিশেষণে ওটা কী হতে পার, তাও কেউ ভাবলেন না। Externment-কে কি বলতে হবে ‘বহিরীণ’? অথচ ‘অন্তরায়ণ, অন্তরায়িত, বহিরায়ণ, বহিরায়িত’ ব্যবহার করলে আপত্তির কারণ থাকে না, সকল দিকে সুবিধাও ঘটে।

নূতন সংঘটিত শব্দের মধ্যে কদর্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে ‘বাধ্যতামূলক শিক্ষা’। প্রথমত শিক্ষার মূলের দিকে বাধ্যতা নয়, ওটা শিক্ষার পিঠের দিকে। বিদ্যাদান বা বিদ্যালাভই হচ্ছে শিক্ষার মূলে–তার প্রণালীতেই ‘কম্পাল্শন্’। অথচ ‘অবশ্য-শিক্ষা’ শব্দটা বলবামাত্র বোঝা যায় জিনিসটা কী। ‘দেশে অবশ্য-শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত’–কানেও শোনায় ভালো, মনেও প্রবেশ করে সহজে। কম্পালসারি এডুকেশনের বাংলা যদি হয় ‘বাধ্যতামূলক শিক্ষা, ‘কম্পালসারি সাবজেক্ট’ কি হবে ‘বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয়’? তার চেয়ে ‘অবশ্য-পাঠ্য বিষয়’, কি সংগত ও সহজ শোনায় না? ‘ঐচ্ছিক’ (optional)

শব্দটা সংস্কৃতে পেয়েছি, তারি বিপরীতে ‘আবশ্যিক’ শব্দ ব্যবহার চলে কি না, পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি। ইংরেজিতে যে-সব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্য প্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। সেটা অনেক সময় বেখাপ হয়ে দাঁড়ায়, অনেক সময় মূল ভাবটা ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয়তো তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়। একদিন ‘রিপোর্ট’ কথাটার বাংলা করবার প্রয়োজন হয়েছিল। সেটাকে বানাবার চেষ্টা করা গেল, কোনোটাই মনে লাগল না। হঠাৎ মনে পড়ল কাদম্বরীতে আছে ‘প্রতিবেদন’—আর ভাবনা রইল না। ‘প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক’—যেমন ক’রেই ব্যবহার করো, কানে বা মনে কোথাও বাধে না। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ‘ওভারপপ্যুলেশন’—বিষয়টা আজকাল খবরের কাগজের একটা নিত্য আলোচ্য; কোমর বেঁধে ওর একটা বাংলা শব্দ বানাতে গেলে হাঁপিয়ে উঠতে হয়—সংস্কৃত শব্দকোষে তৈরি পাওয়া যায়, ‘অতিপ্রজন’। বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্বন্ধে ‘রেসিডেন্ট’, ‘নন্‌রেসিডেন্ট’ বিভাগ করা দরকার, বাংলায় নাম দেব কী? সংস্কৃত ভাষায় সন্ধান করলে পাওয়া যায় ‘আবাসিক’, অনাবাসিক’। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে আমি কিছুদিন সন্ধানের কাজ করেছিলেম। যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমারের প্ররোচনায় প্রকাশ করবার জন্য তাঁর হাতে অর্পণ করলুম। অন্তত এর অনেকগুলি শব্দ বাংলা লেখকদের কাজে লাগবে ব’লে আমার বিশ্বাস।

অকর্ম্মান্বিত– unemployed
অক্ষিভিষক্– oculist
অঘটমান– incongruous, incoherent
অঙ্কূয়ৎ– moving tortuously : অঙ্কূয়তী নদী
অঙ্গারিত– charred
অতিকথিত, অতিকৃত– exaggerated
অতিজীবন– survival
অতিদিষ্ট– overruled

অতিপরোক্ষ– far out of sight
অতিপ্রজন– over-population
অতিভৃত– well-filled
অতিমেমিষ চক্ষু– staring eyes
অতিষ্ঠা– precedence
অতিষ্ঠাবান– superior in standing
অতিসর্গ– act of parting with
অতিসর্গ দান করা– to bid anyone farewell
অতিসর্পণ– to glide or creep over
অতিসারিত– made to pass through
অতিস্রুত– that which has been flowing over
অত্যন্তগত– completely pertinent, always applicable
অত্যন্তীন– going far
অত্যুর্মি– bubbling over
অধঃখাত– undermined
অধিকর্মা– superintendent
অধিজানু– on the knees
অধিবক্তা– advocate
অধিষ্ঠায়কবর্গ– governing body
অনপক্ষেপ্য– not to be rejected
অনপেক্ষিত– unexpected
অনাত্ম্য– impersonal
অনাপ্ত– unattained
অনাপ্য– unattainable
অনাবাসিক– non-resident
অনাবেদিত– not notified
অনায়ক– having no leader
অনায়তন– groundless
অনায়ুষ্য– fatal to long life

অনারত– without interruption
অনার্তব– unseasonable
অনালম্ব– unsupported
অনাস্থান– having no basis or fulcrum
অনিকামতঃ– involuntarily
অনিজক– not one’s own
অনিন– feeble, inane
অনিভৃত– not private, public
অনির্বিদ– undesponding
অনিষ্ঠা– unsteadiness
অনীহা– apathy
অনুকম্পায়ী– condoling
অনুকল্প– alternative
অনুকাঙ্ক্ষা– longing
অনুকাল– opportune
অনুকীর্ণ– crammed
অনুকীর্তন– proclaiming, publishing
অনুক্রকচ– serrated
অনুগামুক– habitually following
অনুজ্ঞা– permission
অনুজ্ঞাত– allowed
অনুতূন্ন– muffied (sound)
অনুদত্ত– remitted
অনুদেশ– reference to something prior
অনুপর্বত– promontory
অনুপার্শ্ব– lateral
অনুযাত্র– retinue
অনুরথ্যা– side-road
অনুলাপ– repetition

অনুষঙ্গ– association
অন্তঃপাতিত– inserted
অন্তম– intimate
অন্তয্য [অন্তর্য]– interior
অন্তরায়ণ– internment
অন্তরীয়– under-garment
অন্তর্জাত– inborn
অন্তর্ভৌম– subterranean
অন্তশ্ছেদ– intercept
অপক্ষেপ– reject
অপচেতা– spendthrift
অপণ্য– not for sale, unsalable
অপপাঠ– wrong reading
অপম– the most distant
অপলিখন– to scrape off
অপশব্দ– vulgar speech অপহাস– a mocking laugh
অপাটব– awkwardness
অপ্রতিষ্ঠ– unstable
অপ্রভ– obscure
অপ্‌সুদীক্ষা– baptism
অবঘোষণা– announcement
অবধুলন– scattering over
অবমতি– contempt
অবমন্তব্য– contemptible
অবরপুরুষ– descendant
অবরার্ধ– the least part
অবর্জনীয়– inevitable
অবশ্চুত– trickled down
অবস্থাপন– exposing goods for sale

অবিতর্কিত– unforeseen
অবুদ্ধিপূর্ব– not preceded by intelligence
অবেক্ষা– observaton
অভয়দক্ষিণা– promise of protection from danger
অভয়পত্র– a safe conduct
অভিজ্ঞানপত্র– certificate
অভিসমবায়– association
অভ্যাঘাত– interruption
অরত– apathetic
অর্থপদবী– path of advantage
অর্ম– ruins, rubbish
অল্পোন– slightly deficient
অশ্রি– angle, sharp side of anything
অসংপ্রতি– not according to the moment
অস্তব্যস্ত– scattered, confused
আকরিক, আখনিক– miner
আকল্প– design
আকৃত– shaped আগামিক– incoming
আঙ্গিক– technique: আঙ্গিকভাব
আচয়– collection
আচিত– collected
আত্মকীয়, আত্মনীয়, আত্মনী– one’s own, original
আত্মতা– essence
আত্মবিবৃদ্ধি– self-aggrandisement
আত্যয়িক– urgent
আনৈপুণ্য– clumsiness
আপতিক– accidental
আপাতমাত্র– being only momentary
আবাসিক– resident

উক্তপ্রত্যুক্ত– discourse
উচ্চয় অপচয়– rise and fall
উচ্চণ্ড– very passionate
উচ্ছিষ্ট কল্পনা– stale invention
উচ্ছ্রায়, উচ্ছ্রিতি– elevation
উৎপারণ– to transport over
উত্তত– stretching oneself upwards
উত্তভিত– upheld, uplifted
উদ্‌গর্জিত– bursting out roaring
উদ্‌ঘোষ– loud-sounding
উদ্ধর্ষ– courage to undertake anything
উদ্‌বাসিত– deported
উদ্যোগসমর্থ– capable of exertion
উন্মিতি– measure of altitude
উন্মুখর– loud-sounding
উন্মুদ্র– unsealed
উন্মৃষ্ট– rubbed off
উপজ্ঞা– untaught or primitive knowledge
উপধুপন– fumigation
উপনদ্ধ– inlaid
উপনিপাত– national calamities
উপপাত– accident
উপপুর– suburb
উপস্কর– apparatus
উলবণ নাদ– shrill sound
ঊনতা– deficiency
ঊর্মিমান, ঊর্মিল– undulating
একতৎপর– solely intent on
একায়ন– footpath

ঐকাঙ্গ– bodyguard
ঐকাত্ম্য– identity
ঐচ্ছিক– optional
ঐতিহ্য– tradition, traditional
কণাকার– granular
কম্বুরেখা– spiral
কম্র– loving, beautiful
করণতা– instrumentality
কাব্যগোষ্ঠী– a conversation on poetry
কাম্যব্রত– voluntary vow (with special aim)
কারু, কারুক– artisan
কালকরণ– appointing time
কালসম্পন্ন– bearing a date
কালাতিক্রমণ– lapse of time
কালান্তর– intermediate time
কির্বির, কির্মীর,– variegated colour, কির্মীরিত
কুটিল রেখা– curved line
কুলব্রত– family tradition
কুশলতা– cleverness
কূণিত– contracted
কৃতাভ্যাস– trained
কৃশিত– emaciated
কেবলকর্মী– performing mere works without intelligence
কেলিসচিব– minister of the sports
ক্রমভঙ্গ– interruption of order
ক্রয়লেখ্য– deed of sale
ক্ষয়িষ্ণু– perishable
ক্ষিপ্রনিশ্চয়– one who decides quickly
গণক-মহামাত্র– finance minister

গর্গর– whirlpool, eddy
গীতক্রম– arrangement of a song
গুম্ফন– grouping
গৃহব্রত– devoted to home
গেহেশূর– carpet-knight
গোত্রপট– genealogical table
গোপ্রতার– ox-ford (যেখানে গোরু পার করে)
গ্রনথকূটী– library
গ্রামকূট– congregation of villages
গ্লান– tried, emaciated
চক্রচর– world-trotter
চটুলালস– desirous of flattery
চতুর্ভূমিক– four-storied
চরিষ্ণু– movable
জড়াত্মক– inanimate, unintelligent
জড়াত্মা– stupid
জনপ্রিয়– popular
জনসংসদ– assembly of men
জনাচার– popular usage
জরিষ্ণু– decaying
জ্ঞানসন্ততি– continuity of knowledge
তনিকা– string, বীণার তার
তনুবাদ– rarified atmosphere
তন্তী– string, বীণার তার
তরঙ্গরেখা– curved line
তরস্থান– landing place
তরস্বতী, তরস্বিনী, তরস্বী– quick-moving
তরুণিমা– juvenility
তাৎকালিক– simultaneous

তাৎকাল্য– simultaneousness
তীর্ণপ্রতিজ্ঞ– one who has fulfilled his promise
দিবাতন– diurnal
দুরভিসম্ভব– difficult to be performed
দুর্গত কর্ম– relief work employment offered to the famine-stricken
দুর্মর– dying hard (diehard)
দৃপ্র– arrogant
দ্বয়বাদী– double tongued
দ্বারকপাট– leaf of a door
দ্রপ্স– a drop
দ্রপ্সী– falling in drops
দ্রব্যত্ব– substance, substantiality
দ্রাংক্ষণ– discordant sound
দ্রাঘিত– lengthened
দ্রোহবুদ্ধি– maliciously minded
ধূম্রিমা– obscurity
নঙর্থক [নঞর্থক]– negative
নভস– misty, vapoury
নাব্য– navigable
নিমিশ্ল– attached to
নির্গামিক– outgoing
নির্ণিক্ত– polished
নির্বাসিক– non-resident
নিষ্কাসিত– expelled
নীরক্ত– colourless faded
পণ্যসিদ্ধি– prosperity in trade
পতিম্বরা– a woman who chooses her husband
পরাচিত– nourished by another, parasite
পরিলিখন– outline or sketch

পরিস্রাবণ– filtering
পরুত্তন– belonging to the last year
পর্পরীণ– vein of a leaf
পর্যায়চ্যুত– superseded, supplanted
পাদাবর্ত– a wheel worked by feet for raising water
পারণীয়– capable of being completed
পিচ্চট– pressed flat, চ্যাপ্‌টা
পুটক– pocket
পুনর্বাদ– tautology
পুরন্ধ্রী– matron
পূর্বরঙ্গ– prelude or prologue of a drama
পৃচ্ছনা, পৃচ্ছা– spirit of enquiry
পৃথগাত্মা– individual
পৃথগাত্মিকতা– individuality
প্রচয়– collection
প্রচয়ন– collecting
প্রচয়িকা–[collection]
প্রচিত– collected
প্রণোদন– driving
প্রতিক্রম– reversed or inverted order
প্রতিচারিত– circulated
প্রতিজ্ঞাপত্র– promissory note
প্রতিপণ– barter
প্রতিপতি– a counterpart
প্রতিবাচক– answer
প্রতিভা–কারয়িত্রী– genius for action
প্রতিভা–ভাবয়িত্রী– genius for ideas, or imagination
প্রতিমান– a model, pattern
প্রতিলিপি– a copy, transcript

প্রতীপগমন– retrograde movement
প্রত্যক্ষবাদী– one who admits of no other evidence than perception by the senses
প্রত্যক্ষসিদ্ধ– determined by evidence of the sense
প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যভিজ্ঞান– recognition
প্রত্যভিনন্দন, প্রত্যর্চন– returning a salutation
প্রত্যরণ্য– near or in a forest
প্রত্যুজ্জীবন– returning to life
প্রথম কল্প– primary or principal rule
প্রপাঠ, প্রপাঠক– chapter of a book
প্রবাচন– proclamation
প্রলীন– dissolved
প্রসাধিত– ornamented
প্রাগ্রসর– foremost, progressive
প্রাণবৃত্তি– vital function
প্রাণাহ– cement used in building
প্রাতস্তন– matutinal
প্রাতিভজ্ঞান– intuitive knowledge
প্রেক্ষণিকা– exhibition
প্রেক্ষার্থ– for show
প্রোল্লোল– moving to and fro
প্রৌঢ়যৌবন– prime of youth
বর্তিষ্ণু– stationary
বশঙ্গম– influenced
বস্তুমাত্রা– mere outline of any subject
বাগ্‌জীবন– buffoon
বাগডম্বর– grandiloquence
বাগ্‌ভাবক–[promoting speech, with a taste for words]
বাতপ্রাবর্তিম– irrigation by wind-power

বিচিতি– collection
বিষয়ীকৃত– realised
বৃত– elected
ভঙ্গিবিকার– distortion of features
ভবিষ্ণু– progressing
ভিন্নক্রম– out of order
ভূমিকা–বাড়ির তলা,
যথা: চতুর্ভূমিক– four-storied
ভেষজালয়– dispensary
ভ্রাতৃব্য– cousin
মণ্ডল কবি– a poet for the crowd
মনোহত– disappointed
মায়াত্মক– illusory
মুদ্রালিপি– lithograph
মুমূর্ষা– desire of death
মৃদুজাতীয়– somewhat soft, weak
মৌল– aboriginal
যথাকথিত– as already mentioned
যথাচিন্তিত– as previously considered
যথাতথ– accurate
যথানুপূর্ব– according to a regular series
যথাপ্রবেশ– according as each one entered (সভাপ্রবেশ সম্বন্ধে)
যথাবিত্ত– according to one’s means
যথামাত্র– according to a particular measure
যন্ত্রকর্মকার– machinist
যন্ত্রগৃহ– manufactory
যন্ত্রপেষণী, জাঁতা– a hand-mill
যমল গান– duet song
রলরোল– wailing, lamenting

রোচিষ্ণু– elegant
লঘুখট্টিকা– easy chair
লোককান্ত– popular
লোকগাথা– folk verses
লোকবিরুদ্ধ– opposed to public opinion
শক্তিকুণ্ঠন– deadening of a faculty
শঙ্কাশীল– hesitating or diffident disposition
শয়নবাস– sleeping garment
শিঞ্জা, শিঞ্জান– tinkling sound
শিথির– flexible, pliant – loose
শিল্পজীবী– an artisan
শিল্পবিধি– rules of art
শিল্পালয়–[art institute]
শ্মীল– winking, blinking
শ্লক্ষ্ণ– slippery, polished
শ্লথোদ্যম– relaxing one’s effort
সংকেতমিলিত– met by appointment
সংকেতকেতন স্থান– a place of assignation
সংক্রমণকা– a gallery
সংরাগ– passion, vehemence
সংলাপ– conversation
সৎকলা– a fine art
সদ্যস্ক, সদ্যস্তন– belonging to the present day
সময়চ্যুতি– neglect of the right time
সমাহর্তা– collector-general
সমূহকার্য– business of a community
সম্প্রতিবিদ্– knowing only the present, not what is beyond
সহজপ্রণেয়– easily led
সহধূরী– colleague

সাংকথ্য– conversation
সাত্ত্বিক ভাবক–[promoting the quality of purity]
সীতাধ্যক্ষ– the head of the agricultural department
সীমাসন্ধি– meeting of two boundaries
সুশ্লক্ষ্ণ– delicate
সৃপ্ত– slipped out or into
সৃপ্র– slippery, lithesome, supple
সৌচিক– tailor
স্ত্রীদ্বেষী– misogynist
স্ত্রীময়– effiminate, womanish
স্ফায়িত– expanding
স্ফির– tremulous
স্বগোচর– one’s own sphere or range
স্বচর– self-moving
স্বপ্রভুতা– arbitrary power
স্ববহিত– self-impelled
স্ববিধি– own rule or method
স্বমনীষা– own judgement or opinion
স্বয়মুক্তি– voluntary testimony
স্বয়ম্বশ– independent
স্বয়ম্বহ– self-moving
স্বয়ম্ভৃত, স্বয়ম্ভর– self-supporting
স্বসম্বেদ্য– intelligible only to one’s self
স্বসিদ্ধ– spontaneously effected
স্বাবমাননা– self-contempt
স্বৈরবর্তী– following one’s own inclination
স্রস্তর, স্রস্তরা– couch, sofa
স্রোতযন্ত্রপ্রাবর্তিম–[water-power irrigation]
হস্তপ্রাবর্তিম–[hand-power motion irrigation]

হৃদয়ভাবক–[promoting the feeling and sensations moved by sentiments]

শব্দ-চয়ন : ২

অকরণ– passive
সকরণ– active
অকারী–[passive]
সকারী–[active]
অক্রম– disorder
অক্রিয়–[passive]
সক্রিয়–[active]
অঙ্গ সংহতি– bodily symmetry, compactness of body
অঙ্গাঙ্গিতা– mutual relation
অঙ্গোঞ্ছ–গামচা [a towel]
অঞ্চিত– curved; অঞ্চিত রেখা
অণিষ্ঠ–অণুতম [most minute]
অতথা– not saying yes, giving a negative answer
অতিঘ্ন– one who is in the condition of utter oblivion
অতিজীব– lively
অতিতর– better, higher
অতিতৃণ্ন– seriously hurt
অতিতৃপ্ত– satiated
অতিত্বরিত–অতিদ্রুত [very fast]
অতিত্রস্নু– very timid

অতিদর্শী– far-sighted
অতিধাবন– to run or rush over
অতিবর্তন– passing beyond
অতিমর্ত্য– super human
অত্বরা– freedom from haste
অত্যণু– very thin
অত্যন্তিক– to close
অত্যভিসৃত– having come too close
অত্যাসন্ন– being too close
অধঃখনন– undermining
অধিকর্ম– superintendence
অননুকৃত্য– inimitable
অনায়ত্ত– independent
অনাশস্ত– not praised
অনিগীর্ণ– not swallowed
অনিরা– languor
অনিরুপ্ত– not distributed, not shared
অনির্জিত– unconquered
অনিস্তীর্ণ– not crossed over
অনীতি– impropriety, immorality
অনুকথিত– repeated
অনুকার, অনুকারী–[imitating]
অনুগুণ– having similar qualities
অনুজন সম্মতি– popular sanction
অনুদেয়– a present
অনুপ্ত– unsown
অনুবর্তন– to follow
অনুবাক– recitation
অনৈতিহ্য– untraditional

অন্তঃশীর্ণ– withered within
অন্তঃস্মিত– inward smile
অন্তঃস্মের– smiling inwardly
অন্তর্গলগত– sticking in the throat
অন্তর্ভাব– inherent nature
অন্তিতম– very near
অন্যোন্যসাপেক্ষ– mutually relating
অপকর্ষ– decline, deterioration
অপপ্রসর– checked, restrained
অপাচী–দক্ষিণ [south] উদীচীর উল্টো
অপাচীন– situated backwards, behind
অপাত্রভৃৎ– supporting the unworthy or worthless
অপিত্র্য– not ancestral
অপ্রতিযোগী– not incompatible with
অপ্রদুগ্ধ– not milked
অবঞ্চনতা– honesty
অবটু– the back or nape of the neck
অবডীন– flight downwards
অবতিতীর্ষু– intending to descend
অবতৃণ্ন– split
অবদংশ– any pungent food, stimulant
অবব্রশ্চ– splinter, chip
অবম– undermost, inferior
অবমর্দিত– crushed
অবরতর– further down
অবরবয়স্ক– younger
অবরস্পর– having the last first, inverted
অবলীন– cowering down
অবশ্যা– hoar-frost

অবশ্যায়–[hoar-frost]
অবসা– liberation
অবস্কর– privy
অবস্তীর্ণ– strewn
অবস্ফূর্জ– the rolling of thunder
অবস্যন্দন– trickle down
অবুধ্ন– bottomless
অবেক্ষণিকা– observatory
অভঙ্গুর– not fragile
অমন্তু– silly
অমম– without egotism
অমম্রি– immortal
অমিনা– impetuous: অমেয়া, অমিতি
অম্বিতমা– dearest mother
অরাল– curved
অর্বাকপঞ্চাশ– under fifty
অশ্লীতপিবতা– invitation to eat and to drink
অসাত্ম্য– unwholesome
অসৌম্য–[disagreeable]: অশোভন
আকাশপথিক–[sky-traveller, sun]
আত্মনীয়তা– originality
আত্মবর্গ– intimate friends
আত্ম্য– personal
আদিৎসা– wish to take
আদিৎসু–[wishing to take]
আদিকালীন– belonging to the primitive time
আনর্ত– dancing room
আনুজাবর– posthumous
আন্তরতম্য– closest relationship

আবশ্যিক– compulsory
আমিশ্ল– having a tendency to mix
আয়ত্তি– magesty, dignity
আরাল–little curved : আরালিত
আশিষ্ট– quickest
আশুকোপী– easily irritated
আশুক্লান্ত– quickly faded
আশুগামী– quickly moving
আসন্দ– chair
ইঞ্চাক– shrimph:ইচা মাছ
ইতাসু– one whose animal spirits have departed
ইষিরা– fresh, vigorous
ইষ্ট ব্রত–[performing desired vows]
ঈর্ষিত– envied
ঈর্ষিতব্য– enviable
ঈর্ষ্যক– envying
ঈর্ষ্যালু– envious
উচ্ছেষ– remainder
উৎকলিকা–[longing for] উৎকণ্ঠা
উত্তমতা– excellence
উত্তরপঞ্চাশ–[over fifty]
উপধূপিত– fumigated
উপনিধি– deposit
উপস্কৃত– furnished
উর্জানী– strength personified
উলুলি–an outcry indicative of prosperity: উলুধ্বনি
উস্রি, উস্রা– morning light
একান্তর– next but one
একোত্তর– greater or more by one

এতষ– dappled–having variegated colour
এষা– running
কটুকিমা– sharpness
কঠোরিত–[strengthened]
কণীচি– a kind of creeper
কথঙ্কথিত– one who is always asking questions; inquisitive
কনক গৌরবর্ণ–জাফরানী রঙ [saffron]
কনীনা– youthful
কপিল– brown, tawny, reddish brown
কপিল ধূসর– brownish grey
কপিশ– reddish brown
কপোত বর্ণ– lead grey
কমা– beautiful
করিষ্ঠ– doing most
কাব্যনিচয়– anthology
কাব্যবিবেচনা– criticism
কাম্ল– slightly acid
কারয়িতা, ভাবয়িতা– genius for action; genius for ideas or imagination
কারী– artist; artificer; mechanic
কুলগরিমা– family pride
কুলচ্যুত– expelled from a family
কুলতন্তু– thread [coming down from a race]
কুলস্থিতি– custom observed in a family
কূটমান– false measure or weight
কূটযুদ্ধ– treacherous battle
কৃতকর্তব্য, one who has done his duty
কৃতত্বর– hurrying
কৃশবুদ্ধি– weakminded

কৃষ্ণপিঙ্গল– dark brown
কৃষ্ণলোহিত– purple
ক্রমভ্রষ্ট– irregular order
গিরিকটক– mountain side
গিরিদ্বার– mountain pass
গিরিপ্রস্থ– plateau; side of a hill
গীথা– a song
গুপ্তস্নেহা– having a secret affection
গেহেবিজিতী– a house hero, boaster
গৌরিমা– the being white
চিচীষা– desire to gather
চীনক (মহাভারত)– Chinese
জনপ্রবাদ, জনবাদ– rumour, report
জলনির্গম– water-course
জ্ঞানদুর্বল– deficient in knowledge
ঝন্‌ঝনিত– tinkling
তথার্থ– real
তনুচ্ছায়–অল্পছায়াবিশিষ্ট [shading little]
তপিষ্ঠ– extremely hot
তমোমণি–[fire-fly]
তরুমণ্ডপ– bower
তলিনা– fine, slender
তুল্যনাম– having the same name
দোষদৃষ্টি– fault-finding
দোষানুবাদ– tale-bearing
দ্রাঘিমা– length
দ্রাঘিষ্ঠ– longest
দ্রোহপর, দ্রোহবৃত্তি–[full of malice, malicious]
দ্রোহভাব– hostile disposition

ধুম্রবুদ্ধি– obscure intellect
নদীবঙ্ক– the bend of a river
নদীমার্গ– course of a river
নদীমুখ– mouth of a river
নানাত্ব– variety, manifoldness
নানাত্যয়– manifold
নিক্বণ– musicalsound
নিচয়– store
নিত্যযৌবনা–[perpetual youth]
নীরাগ–[colourless, faded]
নীলিনী– a species of convolvulus with blue flowers
নেদিষ্ঠ– nearest
পরপরীণ– traditional
পরীবেশ– a halo round the sun or moon
পর্যন্তদেশ– neighbouring district
পর্যন্তস্থিত– adjacent
পর্যাপ্তি– adequacy
পর্যায়ক্রম– order of succession
পলিতম্লান– grey and withered
পাটল– pink
পাণ্ডুর– whitish yellow cream colour
পারতন্ত্র্য–স্বাতন্ত্র্যের বিপরীত [dependence on others]
পারম্পরী– regular succession
পারম্পরীয়– traditional
পিঙ্গল– reddish brown
পিশঙ্গ– tawny
পুররোধ– sieze of a city or fortress
পুরাকথা– an old legend
পুরাবিদ্–[knowing the events of former times]

প্রজ্ঞ– bandy legged
প্রতিচিকীর্ষা– wish to require
প্রতিজীবন– resuscitation
প্রতিবারণ– warding off, preventing
প্রতিবচন, প্রতিবাক্য, প্রত্যুক্তি– answer
প্রতিসংলয়ন– retirement into a lonely place
প্রতিসংলীন– retired
প্রত্যন্তিক– situated at the border, frontiermen
প্রপাত– precipice
প্রভব– origin
প্রসাধন– decoration
প্রসাধনবিধি–[mode of decoration]
প্রাক্পশ্চিমায়ত– running from east to west
প্রাতিভ– intuitive
প্রাতীতিক– subjective
বক্রবাক্য– ambiguous speech
বর্গ– species or genus ◌ঃ যেমন, স্তন্যপায়ীবর্গ
বিকস্বর প্রসারী– expanding
বিনীল– dark blue
বিবেচক– critic
ভাবক আঙ্গিক ভাবক [having a taste...] অনুভাব ভাবক
ভাবানুষঙ্গ–[association of idea]
মাংশচতু– light yelow, dun coloured
মির্মির– twinkling
মুখরেখা– feature
যথাপ্রতিজ্ঞা– according to promise
যথাযথ– suitable, fit, proper
যাচিতক– a think borrowed for use

রজিষ্ঠ– straightest, upright, honest
লীলোদ্যান– pleasure garden
লোকনায়ক–[leader of the worlds]
লোকবার্তা– world’s news
লোষ্টভেদন– a harrow
শক্তিগোচর– within one’s power
শিথিলশক্তি– impaired in strength
শিরিণা (ঋগ্‌বেদ)– night
শীঘ্রকৃত্য– to be done quickly
শ্মীলিত–[winked]
শ্যাব– dark brown
শ্রমখিন্ন– distressed by fatigue
সংখ্যান– calculation
সংখ্যাবিধান– making a calculation
সংজ্ঞু– knock-kneed
সংখাধ্যক্ষ– the chief of the brotherhood
সন্তৃণ্ন– hollowed out, perforated
সমঙ্গী– complete in all parts
সময়াচার– conventional or established practice
সমস্থল– level country
সমূহ– association, community
সম্যক্ প্রয়োগ– right use
সম্যগ্ দর্শন, দৃষ্টি– right perception, insight
সম্যগ্‌বোধ– right understanding
সাংকথিক– excellent in conversation
সাহিত্যগোষ্ঠী–[a conversation on literature]
সুহিত–kind : সুহিতা
সৃজতি– creation
সেরাল– pale yellow

স্কন্ধপ্রাবর্তিম–[দ্র. হস্তপ্রাবর্তিম : শব্দচয়ন ১]
স্তিমিত নয়ন– having the eyes intently fixed
স্ত্রীবাক্যাঙ্কুশপ্রক্ষুণ্ন– driven on by the goad of a woman’s words
স্ফারফুল্ল– full blown
স্ফুটফেনরাজি– bright with lines of foam
স্ফুরণ– glittering, throbbing, vibration, pulsation, twinkling
স্ফুরৎ তরঙ্গজিহ্ব– having tongue like waves
স্ফুরৎ প্রভামণ্ডল– surrounded by a circle of tremulous light
স্বচ্ছন্দতঃ– spontaneously
স্বচ্ছন্দতা– independent action
স্বচ্ছন্দভাব– spontaneity
স্বদনীয়– palatable
স্বয়ম্পাঠ– original text
স্বসমুত্থ– arising within self
স্বৈরাচার–[of unrestrained conduct or behaviour]
স্বৈরালাপ–[unreserved conversation]
স্বৈরাহার–[abandant food]

রবীন্দ্রনাথ-কৃত শব্দচয়ন ১ ও ২-সংখ্যক তালিকায় যেখানে ইংরেজি অর্থ বা প্রতিশব্দের উল্লেখ নাই সে-সব ক্ষেত্রে [] বন্ধনী-মধ্যে মনিয়ের উইলিয়ম্‌স্‌-এর অভিধান হইতে ইংরেজি অর্থ সংকলন করিয়া দেওয়া হইল।

উপসংহার : দৃষ্টান্তবাক্য

অকরণ passive আমাদের সমাজে যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে সে অকরণভাবে,
সকরণ active সকরণ বুদ্ধিদ্বারা আমরা তাকে চালনা করি না।
অঙ্গসংহতি bodily symmetry, compactness of body
গ্রামে যে জনসভা স্থাপিত হইয়াছে এখনো তাহা শিথিলভাবেই আছে তাহার অঙ্গসংহতি ঘটে নাই।
অঙ্গারিত charred–প্রাচীন জন্তুর কয়েকখণ্ড অঙ্গারিত অস্থিমাত্র পাওয়া গিয়াছে।

অকর্মান্বিত unemployed—আমেরিকার অকর্মান্বিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

অঙ্গাঙ্গিতা mutual relation—আমাদের দেশের উচ্চবর্ণের লোকের সঙ্গে অন্ত্যজদের অঙ্গাঙ্গিতার অভাব।

অতিকথিত, অতিকৃত exaggerated—অতিকৃত রেখার দ্বারা তাঁহার ছবিকে ব্যঙ্গাত্মক করা হইয়াছে।

ঝির্ঝির twinkling—এই জ্যোতিষ্কটি গ্রহ নহে নক্ষত্র তাহা তাহার ঝির্ঝির আলোকে সপ্রমাণ হয়।

অতিদিষ্ট overruled—একদা যে বিধি কর্তৃপক্ষের আদিষ্ট ছিল বর্তমানে তাহা অতিদিষ্ট হইয়াছে।

অধিষ্ঠায়ক বর্গ governing body—অধিষ্ঠায়কবর্গের নিকট বিদ্যালয়ের প্রতিবেদন প্রেরিত হইয়াছে।

অধিকর্মা superintendent—বিদ্যালয়ের অধিকর্মা পদে কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় নাই।

অনাত্ম্য impersonal—অনাত্ম্যভাবের রাজ্যশাসন প্রজার পক্ষে হৃদ্য নহে। বৈজ্ঞানিক সত্য অনাত্ম্য সত্য।

অননুকৃত্য inimitable—রঙ্গমঞ্চে তাঁহার প্রয়োগনৈপুণ্য অননুকৃত্য।

অনুজ্ঞাত allowed—মন্দিরে হীনবর্ণের প্রবেশাধিকার প্রাঙ্গণ পর্যন্ত অনুজ্ঞাত।

অনুদত্ত remitted

অনুদেশ reference to something prior —যথাকালে তাঁহার বৃত্তি অনুদত্ত হইয়াছে কিনা তাঁহার পত্রে তাহার কোনো অনুদেশ পাওয়া যায় না।

অনুপার্শ্বগতি lateral movement—বালুকারাশি অনুপার্শ্বগতিতে সরিয়া আসিয়া কূপ পূর্ণ করিয়াছে।

আত্ম personal—সঙ্গে একটিমাত্র তাঁহার আত্ম্য অনুচর (personal attendant) ছিল।

অনুযাত্র retinue —তাঁহার অনুযাত্রদের মধ্যে তাঁহার অন্তম বন্ধু কেহই ছিল না।

অন্তম intimate

অন্তঃপাতিত inserted—কালির রঙ দেখিয়া অনুমান করা যায় পুঁথির মধ্যে

এই বাক্যগুলি পরে অন্তঃপাতিত।

অন্তর্ভৌম subterranean—ভূমিকম্পের পূর্বে একটি অন্তর্ভৌম ধ্বনি শুনা গেল।

অন্তরীয় undergarment—পশমের অন্তরীয় বস্ত্র ঘর্মশোষণের পক্ষে উপযোগী।

অন্তরায়ণ internment—রাষ্ট্রিক অপরাধে অন্তরায়িতের প্রতি পীড়ন বর্বরতা।

অপণ্য unsaleable, not for sale—প্রদর্শনীর বিশেষ চিহ্নিত চিত্রগুলি অপণ্য।

অপম the most distant—অন্তম ও অপম আত্মীয়দের লইয়া একান্নবর্তী পরিবার।

অপশব্দ vulgar speech—অপশব্দ অনেক সময় সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা শক্তিশালী।

অপ্রতিষ্ঠ unstable—রাষ্ট্রব্যবস্থা কিছু পরিমাণে অপ্রতিষ্ঠ থাকা প্রজাদের স্বাধীনতার পক্ষে অনুকূল।

অবর্জনীয় inevitable—কোনো দুঃখকেই অবর্জনীয় বলিয়া উদাসীন হওয়া মনুষ্যোচিত নহে।

অভিজ্ঞানপত্র certificate—তাঁহার উদার ললাটেই বিধাতার স্বহস্ত-রচিত অভিজ্ঞানপত্র।

অভ্যাঘাত interruption—উপদেশ চেষ্টা আখ্যান বিষয়ের অভ্যাঘাত।

অরত apathetic—বান্ধবদের প্রতি যাহার অরতি সর্বত্রই তাহার চিরনির্বাসন।

অরাল curved—অরাল পক্ষ্ম কৃষ্ণায়ত চক্ষু।

অর্ম ruins, rubbish—নদীগর্ভের পঞ্চাশ ফুট নিম্নে প্রাচীন অর্মস্তূপ পাওয়া গেল।

অস্তব্যস্ত scattered, confused—তাঁহার রচনায় ভাবসংহতি নাই, সবই যেন অস্তব্যস্ত।

আত্মতা essence—বীর্যের আত্মতাই ক্ষমা।

আত্মবিবৃদ্ধি self-aggrandisement—আত্মবিবৃদ্ধির অসংযমেই আত্মবিনাশ।

আত্মকীয় original—তাঁহার লেখায় স্বকীয়তা [আত্মকীয়তা] নাই সমস্তই অনুকরণ।

উক্ত প্রত্যুক্ত discourse—এই গ্রনথটি আকবরের রাজনীতি সম্বন্ধে উক্তি

প্রত্যুক্তি।

উপধূপিত fumigated–রোগীর বিছানা গন্ধক বাষ্পে উপধূপিত করা হইল।

আবাসিক resident –আবাসিক ছাত্রদের বেতন কুড়ি টাকা।

অনাবাসিক non-resident–অনাবাসিকদের দেয় ছয় টাকা।

আগামিক incoming–আমাদের আগামিক সভাপতি পরমাসে কাজে যোগ দিবেন।

বিষয়ীকৃত realised–মনে যে আদর্শ আছে জীবনে তাহা বিষয়ীকৃত হয় নাই।

আঙ্গিক technique–এই চিত্রের গুম্ফন যেমন সুন্দর আঙ্গিক তেমন নয়।

গুম্ফন grouping

শব্দ-চয়ন : ৩

বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় যে-সব প্রতিশব্দের উল্লেখ আছে প্রবন্ধের বিন্যাসক্রমে সেগুলি সংকলিত হইল :

উপসর্গ-সমালোচনা।।

অপহরণ– abduction
দন্তহীন– edentate
অন্তরেজাত– innate
আসন্ন– adjacent
আক্ষিপ্ত– adjective
আবদ্ধ– adjunct
অভিনয়ন– adduce
অভিদেশ অভিনির্দেশ– address
অভিবর্তন– advent

বাংলা শব্দদ্বৈত।।
পুনর্বৃত্তি– repetition
ধ্বন্যাত্মক শব্দ।।
নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোক– silent spheres
বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত।।
একমাত্রিক– monosyllabic
বাংলা ব্যাকরণ।।
শাব্দিক–[philologist]
বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌রূপ।।
তির্যক্‌রূপ– oblique form
নাম সংজ্ঞা– proper names
প্রতিশব্দ।।
* অধিজাতি– nation
* অধিজাতিক– national
* অধিজাত্য– nationalism
* প্রবংশ– race
প্রবংশ রক্ষা– race preservation
জাতি সম্প্রদায়– tribe
জাতি, বর্ণ– caste
মহাজাতি– genus
উপজাতি–species
প্রজাত– generation
নিজমূলক – originality
স্বকীয়তা – originality
অপূর্ব– strange
আদিম–original
দরদ– sympathy
অনন্যতন্ত্র– originality
আবেগ, হৃদয়বেগ– emotion

চিত্তোৎকর্ষ, সমুৎকর্ষ–culture
উৎকর্ষিতচিত্ত, উৎকর্ষবান– culture-minded
অপজাত– degenerate
আপজাত্য– degeneracy
প্রজনতত্ত্ব–genetics
সৌজাত্যবিদ্যা– ugenics
বংশানুগতি– heredity
বংশানুগত–inherited
বংশানুলোম্য– inheritable
অভিযোজন– adaptation
অভিযুজ্যতা– adaptability
অভিযোজ্য– adaptable
অভিযোজিত– adapted
অনুরক্তি– interest
স্বতঃসৃত– spontaneous
প্রতিক্ষিপ্ত– reflex
প্রসমীক্ষা, প্রসমীক্ষণ, পূর্ব-বিচারণা– forethought
সূচনা, অভিসংকেত–suggestion
সূচনাশক্তি– suggestiveness
স্বাভিসংকেত– auto-suggestion
বিসংগত সত্য, বিসংগত বাক্য– paradox
ব্যঙ্গানুকরণ– parody
শখ– amateur
পাটল– violet
পল্লবগ্রাহী– dilettante
দ্বৌমানসিকতা, দ্বৈতমানস– two mindedness
দ্বৈতমনা– two minded
মহান– sublime
মহিমা– sublimity

স্বরসংগম, স্বরসংগতি– harmony
স্বরৈক্য– concord
বিস্বর– discord
ধ্বনিমিলন– symphony
সংধ্বনিক– symphonic
রোমাঞ্চিত, তৃণাঞ্চিত– curved
বাণী, মহাবাণী– the voice
* জাত– caste
জাতি– race
*রাষ্ট্রজাতি– nation
জনসমূহ– people
*প্রজন– population
আকাশবাণী, বাক্প্রসার– broadcast
বুদ্ধিগত মৈত্রী, বুদ্ধিমূলক মৈত্রী, বুদ্ধিপ্রধান মৈত্রী, মৈত্রীবোধ– intellectual friendship
ভাবপ্রধান, হৃদয়প্রধান– emotional
মনঃপ্রকর্ষ, চিত্তপ্রকর্ষ–culture
প্রকৃষ্টচিত্ত, প্রকৃষ্টমনা– cultured
উৎকৃষ্টি–culture
বুদ্ধিগত সংরাগ– intellectual passion
সংরাগ– passion
বুদ্ধিগত ব্যক্তিত্ব– intellectual self
দেহপ্রকর্ষ চর্চা– physical culture
* শিলক–fossil
* শিলীকৃত–fossilized
* অবমানব–sub-man
* প্রাকপ্র স্তর–eolith
* প্রাক্মা নব–eoanthropus
* প্রাগাধুনিক–eocene

* পুরাজৈবিক–proterozoic
পটভূমিকা, পশ্চাদ্‌ভূমিকা, পৃষ্ঠাশ্রয়, অনুভূমিকা, আশ্রয়, আশ্রয়বস্তু– background
সংকেত, লক্ষ্য, উদ্দেশ, উদাহরণ, অভিনির্দেশ, অভিসংকেত– allusion
পরিচয়– reference
গত মাসিক– proximo
আগামী মাসিক– ultimo
প্রতিমা– image
প্রদোষ– twilight
সাংস্কৃতিক ইতিহাস– cultural history
সংস্কৃত চিত্ত– cultured mind
সংস্কৃতবুদ্ধি– cultured intelligence
সংস্কৃতিমান– cultured
প্রৈতি– impulse
নৈসর্গিক নির্বাচন– natural selection
শিলাবিকার– fossil
শিলবিকৃত, শিলীভূত– fossilized
চারিত্র, চারিত্রশিক্ষা, চারিত্রবোধ, চারিত্রোন্নতি– ethics
তত্ত্ববিদ্যা– metaphysics
কেন্দ্রানুগ–সেন্‌ট্রিপীটাল [centrepetal]
কেন্দ্রাতিগ–সেন্‌ট্রিফ্যুগাল [centrifugal]
শিলাবিকার– metamorphosed rock
জীবশিলা–ফসিল [fossil]
নভোবিদ্যা–মিটিয়রলজি [meteorology]
প্রতিষ্ঠান– institution
অনুষ্ঠান– ceremony
অনুবাদ-চর্চা।।
নিত্যনির্বন্ধ=persistent
বাদানুবাদ।।

কুলসঞ্চারিতা= heredity
কুলসঞ্চারী=inherited
বানান-বিধি।।
বৈয়াকরণিক– grammarian
চিহ্নবিভ্রাট।।
অবন্ধ– essay
বাংলাভাষা ও বাঙালি চরিত্র।।
রোথো।– commonplace

শব্দচয়ন : ৪

অক্ষর-যোজক	compositor
অগত্যা-প্রেরিত খাটুনি	forced labour
অনামা চিঠি	unanimous letter
অন্তর্মনস্ক	introvert
অসিতচর্ম	coloured
আজ্ঞেয়িক	agnostic
আঁকনপট	canvas
আপিসি শাসন	burocracy
উপরাজ্য	satellite state
কদুৎসাহী	Zealot
কৃতকপুত্র	foster son
গঠন পত্রিকা	constitution, prospectus
গর্তগড়	dug-out
গোষ্ঠবিদ্যা	animal husbandry

চতুষ্পথ	crossing
চন্দ্রালোক গীতিকা	moonlight sonata
চরম তিরস্করণী	drop scene
চর্মপত্র	parchment
চিত্রবয়ন	embroidery
জনাদর	popularity
তড়িৎমাপক সূচী	galvanometer
তাপজনক খাদ্য	caloric food
দরখাস্ত পত্রিকা	application
ধর্মমূঢ়বুদ্ধি	bigotry
নরভুক্	cannibal
নৈহারিকতা	nebulocity
পরিণামদারুণ	tragic
পরিণামবাদ	theory of evolution
পরিপ্রেক্ষণিকা	perspective
পরিপ্রেক্ষণী	perspective
পরিপ্রেক্ষিত	perspective
প্রত্যক্ষরীকরণ	transliteration
ভীতধ্বনি	alarm
মনোবিকলনমূলক	psycho-analytical
মাশুলখানা	Custom House
মিতশ্রমিক যন্ত্র	labour -saving machine
রূঢ়িক	elementary
শেষমোকাম	terminus
সাদর পত্র	testimonial
স্বজাতিপূজা	Cult of Nationalism
স্বতশ্চালিত	automobile
স্বাঙ্গীকরণ	assimilation
স্বৈচ্ছিক	optional

স্বৈরশাসক	despot
হনুকরণ	aping